দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

চীনের জমি বাড়াবার
নীতি ঐতিহাসিক
মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে
পৃঃ - ১২

কাশ্মীর সমস্যা :
একজন ভারতীয়
নাগরিকের
উপলব্ধি
পৃঃ - ২৯

৬৯ বর্ষ, ৬ সংখ্যা।। ৩ অক্টোবর ২০১৬।। ১৬ আশ্বিন - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ৬ সংখ্যা, ১৬ আশ্বিন, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

৩ অক্টোবর - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

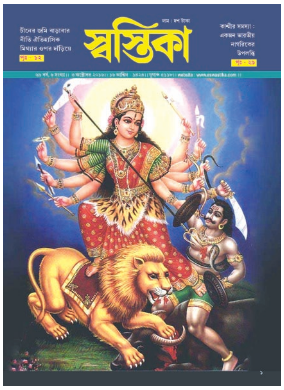

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

খোলা চিঠি : মমতা দাও মা দুর্গা ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৯

চীন নয়, ভারতই নেপালের প্রকৃত বন্ধু

▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

এবার লক্ষ্য ভারতীয় জাতীয়তার বিকৃতি

▯ এন সি দে ▯ ১১

চীনের জমি বাড়াবার নীতি ঐতিহাসিক মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে

▯ সুভাষ মোহান্ত ▯ ১২

ভারতমাতার পূজাই প্রকৃত দুর্গাপূজা

▯ স্বামী বিষ্ণুপুরী মহারাজ ▯ ১৪

মোর অনুভবে তুমি মা দুর্গে

▯ ড. তুষার কান্তি ঘোষ ▯ ১৫

বনেদি বাড়ির দুর্গাপূজা

▯ সপ্তর্ষি ঘোষ ▯ ১৮

যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা

▯ স্বামী সুনিশ্চিতানন্দ ▯ ২১

চণ্ডীপাঠ সম্প্রচারের আদিগুরু বীরেন্দ্রকৃষ্ণ

▯ রূপশ্রী দত্ত ▯ ২৩

পাকিস্তানের রটানো কলঙ্ক থেকে মুক্তি

▯ চিদানন্দ রাজঘাট্টা ▯ ২৭

কাশ্মীর সমস্যা : একজন ভারতীয় নাগরিকের উপলব্ধি

▯ প্রণব দত্ত মজুমদার ▯ ২৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯

অন্যরকম : ৩৩ ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৫-৩৮** ▯

শব্দরূপ : ৪০ ▯ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৪ অক্টো., '১৬

প্রকাশিত হবে
২৪ অক্টো., '১৬

আগামী সংখ্যাই দীপাবলী সংখ্যা

পঞ্চসাধকের কালী-সাধনা

এবিষয়ে লিখেছেন— স্বামী বেদানন্দ, ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, সন্দীপ দাঁ, উজ্জ্বল মণ্ডল প্রমুখ।

দাম ১০্ টাকাই থাকছে। সত্বর কপি বুক করুন।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরুবাদ থেকে মুক্তিতেই দেশের উন্নতি

উরিতে ১৮ জন সেনার শহিদ হওয়ার পর দেশবাসীর একটি বড় অংশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বদলা লইতে চাহিতেছেন। দেশবাসীর এই ক্ষোভকে সম্মান জানাইলেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কোঝিকোড়ের দলীয় মঞ্চেই স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন যে যুদ্ধ নয়, তবে পাকিস্তানকে চাপে রাখিতে সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটিগুলিতে প্রত্যাঘাতের সম্ভাবনা-সহ সিন্ধুজল চুক্তি পুনর্বিবেচনার মতো কূটনৈতিক অস্ত্রের প্রয়োগ করিবেন। কোঝিকোড়ে বিজেপি-র রাষ্ট্রীয় অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী সেক্যুলারিজমের পরিভাষার ব্যাখ্যা ও বিকৃত প্রয়োগের বিষয়টি উত্থাপন করিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রীর উত্থাপিত প্রসঙ্গটি যে জরুরি তাহা লইয়া কোনো সন্দেহ নাই। ভারতে সংবিধান স্বীকৃত যেসব প্রমুখ ধারণার বিকৃত ব্যাখ্যা হইতেছে ধর্মনিরপেক্ষতা তাহার মধ্যে প্রধান। ঘটনা হইল 'সেক্যুলারিজম'-এর সমার্থক শব্দ হিসাবে ভারতীয় ভাষায় ধর্মনিরপেক্ষতা করা হইয়াছে। যদিও ধর্মের সঙ্গে উপাসনা-পদ্ধতি, মত বা পন্থের কোনো সম্বন্ধ নাই। ভারতীয় ভাবনায় ধর্ম অর্থে কর্তব্য বোঝায়। পরিস্থিতি অনুসারে যে কর্তব্য পালন করা উচিত তাহাই ধর্ম। সত্য হইল, সেক্যুলারিজম্ ভারতের নিকট এক বিজাতীয় ধারণা। এই ধারণার সহিত এই দেশের কোনো সম্পর্ক নাই। যে দেশের আদর্শ 'বসুধৈবকুটুম্বকম্', 'সেক্যুলারিজম'-এর ধারণা তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না, বিকৃত সেক্যুলারিজম তো কখনই নহে। সেক্যুলারিজমের বিকৃত ব্যাখ্যা শুধু রাজনীতি নয়, ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রেও অশুভ। বর্তমানে সেক্যুলারিজমের অর্থ হইল একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ চিন্তা এবং এই রাজনীতির কারণে সংখ্যালঘুবাদ মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে। এই সংখ্যালঘুবাদের ধারণাটিকে মুসলমান সমাজকেই উৎপাটিত করিতে হইবে। ইহা না করিলে তাহারা রাষ্ট্রীয় মুখ্যধারা বা জীবনপ্রবাহের অঙ্গীভূত হইতে পারিবে না। আর ইহা না করিতে পারিলে সমস্যারও সমাধান হইবে না। রাজনৈতিক দল ও নেতাদের ইহা বুঝিতে হইবে যে সংখ্যালঘুবাদ ও সংখ্যাগুরুবাদ হইতে মুক্ত হইলেই দেশের বৈভবশালী হওয়া সম্ভব।

দেশের বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল বিজেপি-কে যতই সাম্প্রদায়িক দল বলুক না কেন, বিজেপি-কে রুখিতে যতই জোটবদ্ধ হউক না কেন, ঘটনা হইল দেশের মানুষ এইসব অভিযোগ উপেক্ষা করিয়াছে এবং বিজেপি নিজস্ব শক্তিতে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হইয়াছে। এই ঘটনা হইতে রাজনৈতিক দলগুলির শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত। রাজনৈতিক দলগুলি শিক্ষাগ্রহণ করিবে কিনা তাহা বলা না যাইলেও মুসলমান সমাজের বোঝা দরকার যে সেক্যুলারিজমের নামে যে রাজনীতি বা তথাকথিত উন্নয়নের কথা বলা হইতেছে তাহাতে তাহাদের সর্বাধিক ক্ষতি হইতেছে। মুসলমান সমাজ এক ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে উঠিয়া আসিয়াছে এবং বিজেপি-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বিজেপি-জুজু দেখাইয়া নিজেদের পালে হাওয়া টানিতে চাহিতেছে। মুসলমান সমাজ রাষ্ট্রীয় মুখ্য ধারার অঙ্গ না হইতে চাহিলে তাহার কারণ হিসেবে সেক্যুলারিজমের বিকৃত ব্যাখ্যাকেই দায়ী করিতে হইবে।

সেক্যুলারিজিমের বিকৃত ব্যাখার উল্লেখ করিয়া প্রধানমন্ত্রী শুধু বিরোধী দলগুলিকেই বার্তা দেন নাই, সেইসঙ্গে জাতীয়তার প্রকৃত অর্থ কী তাহাও বুঝাইয়াছেন। সকলকে সঙ্গে লইয়া চলাই প্রকৃত রাষ্ট্রীয়তা। যদি 'সব কা সাথ সব কা বিকাশ'—এই স্লোগানকে এক আন্দোলনে পরিণত করা যায় তবে সেক্যুলারিজমের যে বিকৃত ধারণা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা অদূর ভবিষ্যতে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। প্রধানমন্ত্রীর উত্থাপিত জরুরি ও বিতর্কিত প্রসঙ্গটি তাই জনমতনির্বিশেষে গভীরভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

সুভাষিতম্

জ্ঞাননেত্রং সমাদায় চরেৎ বুদ্ধিমতঃ পরম্।
নিষ্কলং নির্মলং শান্তং তৎ ব্রহ্মোঽহমিতি স্মৃতম্।। (উপনিষদ)

জ্ঞাননেত্র খোলা রেখে বুদ্ধিমান ব্যক্তি জগতে চলাফেরা করেন। মনে মনে তিনি এই স্মৃতিটি জাগিয়ে রাখেন যে, যিনি নিষ্কল, নির্মল, শান্ত ব্রহ্মপুরুষ, তিনিই হলেন 'আমি'।

মালদায় নদীভাঙনে দুর্গতদের সঙ্ঘের ত্রাণ

তরুণ কুমার পণ্ডিত : মালদা॥ গত জুলাই এবং আগস্ট মাস থেকে মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর ব্লকের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙন এবং বন্যার ফলে হাজার হাজার মানুষ যে ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে রাজ্যের মানুষের কাছে এখনও তা অজানা রয়ে গেছে। গত ২৯ জুলাই মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর ব্লকের বীরনগর, পারদেওনাপুর, শোভাপুর, কুম্ভিরা, বাখরাবাদ ও কৃষ্ণপুরের ৫টি অঞ্চল গঙ্গা ভাঙনের কবলে পড়ে। পরের দিন ৩০ জুলাই থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা ত্রাণসামগ্রী নিয়ে দুর্গত পরিবারের কাছে পৌঁছে যায়। ত্রাণকাজ চলার সময়ই বীরনগর গ্রামের সরকার টোলা,

মুকুন্দ টোলার প্রায় ৩০০ বাড়ি গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে যায়। কাঁচা ও পাকা বাড়ি জমি সমেত ১৫০টি পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে বাঁধের ওপর অস্থায়ী তাঁবুর তলায় আশ্রয় নেয়। অনেকেই তাদের আসবাবপত্র বাড়ির ইট কাঠ সরাতে পেরেছে, আবার অনেকে তাও পারেনি। বৈষ্ণবনগর বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক স্বাধীন সরকারের বাড়ি সমেত অনেকের বাড়ি গঙ্গার গ্রাসে চলে গেছে। একই ভাবে পারদেওনাপুর, শোভাপুর ও বাখরাবাদ অঞ্চলের পরে অনুপনগর, ঘোষপাড়া ও চৌধুরীপাড়ার ৫০০টি বাড়ি সম্পূর্ণ গঙ্গাগর্ভে চলে যায়। এছাড়া অনুপনগর রিফিউজিপাড়ার অর্ধেক, পারলালপুর ২নং কলোনির ৫টি পাড়া এখন ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সব মিলিয়ে ৫০ হাজার মানুষ নদী ভাঙন এবং বন্যার জলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুনর্বাসনের জন্য বীরনগর অঞ্চলের মানুষরা সরকারি জমি পাওয়ার আশ্বাস পেলেও পারদেওনাপুর শোভাপুর অঞ্চলের বন্যায় আক্রান্ত পরিবারগুলি স্থায়ী বসবাসের কোনো জায়গা এখনও পায়নি। মালদা থেকে কুম্ভিরা হয়ে শোভপুর যাওয়ার পাকা রাস্তাটি জলের তোড়ে ভেঙে যায়। ফলে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে পৌঁছাতে ধুলিয়ান হয়ে নৌকার সাহায্য নিতে হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না থাকার জন্য ত্রাণকর্মীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে। গত দুই মাসে সরকারি ত্রাণসামগ্রী তেমন ভাবে না পৌঁছলেও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্থানীয় সেবা বিভোগের পক্ষ থেকে যথেষ্ট ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। বিডিও দুর্গত স্থানে এলে বিশৃঙ্খল ত্রাণবন্টনের জন্য বিক্ষোভের মুখে পড়েন। অপর দিকে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা ত্রিপল, চিঁড়ে, দুধ, চিনি, গুড়, চাল বিতরণ করেন এবং সেখানে কোনো বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সঙ্ঘ এবং বিজেপি-র পক্ষ থেকে ১০০০ ত্রিপল, ৫০০ মাদুর, ৪০ কুইন্টাল চিঁড়ে, তিন কুইন্টাল চিনি, চার কুইন্টাল গুড় ও ৫০ কুইন্টাল চাল বিতরণ করা হয়েছে। ধুলিয়ান ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, মালদা মার্চেন্ট চেম্বারস, সেন্টজন অ্যাম্বুলেন্স এবং রেড ক্রসের মাধ্যমে বিস্কুট, জামা প্যান্ট বিতরণ করা হয় বন্যাদুর্গত মানুষদের মধ্যে। সরকারি ভাবে দুপুরের ও রাত্রের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হলেও সকালের জলখাবারের জন্য সঙ্ঘের পক্ষ থেকে এখনও চিড়াগুড় ও দুধ বিতরণ করা হচ্ছে। ৫০ জন স্বয়ংসেবকের একটি দল এবং স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় পারলালপুর ১ ও ২ নং, পার অনুপনগর, পারদেওনাপুর, ৩ নং কলোনি, শুকপাড়া, পারপরানপাড়া, আনন্দপুর, শিবপুর ক্যাম্পপাড়া ও হিজলতলাতে ৪০০০ মানুষকে ত্রাণ বিতরণ করেছে। ভিটে মাটি ও জমি গঙ্গাগর্ভে চলে যাওয়ায় এই অসহায় মানুষগুলো সরকারি জমি পেয়ে বাড়ি তৈরি করার আশায় বসে আছে। ঝড়, বৃষ্টি ও রৌদ্রের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া এখন তাদের কাছে সব চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। শোভাপুর অঞ্চলের পারলালপুর গ্রামের দুলাল সরকার ও রঞ্জিত সরকার জানালেন— এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে সঙ্ঘ যদি পাশে না দাঁড়াতো তবে এই এলাকার গঙ্গাভাঙনে ও বন্যায় দুর্গত মানুষগুলিকে অনাহারে এবং খোলা আকাশের নীচে থাকতে হোত। এখন জল কমতে থাকায় ব্লিচিং পাউডার এবং রোগের প্রকোপ বাড়ায় ওষুধপত্রের দরকার হচ্ছে। সরকারি ভাবে ওষুধপত্র ও ব্লিচিংপাউডার এইসব অঞ্চলে এলেও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কম। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে একটি মেডিক্যাল টিম এই দু' মাসে দু'বার বসেছে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর ডাক্তারের একটি টিম সঙ্ঘের সেবা বিভাগের উদ্যোগে বন্যাদুর্গত মানুষদের সারাদিন ধরে চিকিৎসা-সহ ওষুধ ইত্যাদির ব্যবস্থা করে বলে জানা গেছে।

বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি নদীভাঙন ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং পূজার সময় দুর্গতদের নতুন বস্ত্র বিতরণ করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সব মিলিয়ে কালিয়াচক ও বৈষ্ণবনগরের ৫০ হাজার মানুষের প্রতি এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দেশের মানুষ সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবেন বলেই আশা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গঙ্গার নাব্যতা কমে যাওয়া গঙ্গাভাঙনের অন্যতম একটি বড় কারণ হিসাবে নদীবিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

সীমান্তে বি এস এফের অটল প্রহরা গোরু-পাচার প্রায় বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত বছর মোদী সরকারের কাছ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়ার পর থেকেই গোরু পাচার বন্ধ করতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। যার ফলে এ বছর গোরুপাচার প্রায় নগণ্যে এসে ঠেকেছে। গোমাংসের প্রয়োজনে বাংলাদেশের ভরসা এখন তাদের নিজের দেশের গোরু। এই প্রথম বাংলাদেশের একজন পদস্থ আমলা স্বীকার করেছেন ভারত থেকে বাংলাদেশে গোরু পাচার প্রায় ৯৯ শতাংশ কমে গেছে এবং যে ১ শতাংশ এখনও চলছে তাও সীমান্ত সিল করে দেওয়ার মাধ্যমে বন্ধ করার চেষ্টা চলছে।

উত্তর চব্বিশ পরগনা সীমান্তের ওপারে যশোর জেলায় কর্তব্যরত বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিজিবি) অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর খলিলুর রহমান বলেন, 'ভারত থেকে বাংলাদেশে গোরুপাচার একরকম বন্ধই হয়ে গেছে। সামান্য যেটুকু এখনও হয় তাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করে কাস্টমসের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সীমান্তে বিএসএফের কঠোর ভূমিকা, স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতা এবং ভারতব্যাপী গোরক্ষকদের গো-হত্যা বিরোধী আন্দোলন বাংলাদেশে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। সম্প্রতি শেখ হাসিনা সরকার গোমাংসের প্রয়োজনে বাংলাদেশের গোরু ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়। দেখা যায় বাংলাদেশে গবাদি পশুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এতকাল গবাদি পশুর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ এটাই। রহমান বলেন, 'ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে গোরুপাচার উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে। গত বছর যেখানে দিনে ১১০০০ গোরু পাচার হোত এ বছর সেখানে দিনে ২০০-৩০০টা করে হয়।'

খলিলুর রহমান জানান, সীমান্তের এই জঘন্য ব্যবসা বন্ধ করার জন্য শেখ হাসিনা সরকার সবধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। সেই সঙ্গে বাংলাদেশে গবাদি পশুর উৎপাদন বাড়ানোও সরকারের লক্ষ্য। কারণ বাংলাদেশের বাজারে একটি দেশীয় গোরুর দাম ৬০ হাজার টাকা। কিন্তু পাচার হওয়া ভারতীয় গোরুর দাম ৮০ হাজার টাকা। সুতরাং দেশে গবাদি পশুর উৎপাদন যত বাড়বে ভারতের গোরুর ওপর নির্ভরতাও তত কমবে। উন্নতি হবে দেশের অর্থনীতিরও। যশোর ক্ষেত্রের আরেক আধিকারিক মেজর নজরুল বলেন, গবাদি পশু শিল্পে উন্নতি হওয়ায় বাংলাদেশের মানুষ খুবই খুশি। বাংলাদেশের চাষিরা এখন গোরু পিছু ভালো দাম পাচ্ছেন।

এদিকে, বিএসএফের কাছ থেকেও বাংলাদেশের আধিকারিকদের বক্তব্যের সমর্থন মিলেছে। বিএসএফের ডিরেক্টর জেনারেল এস কে বড়ুয়া বলেন, বাংলাদেশে গোরু পাচার এখন অনেকটাই কম। আগে যেখানে বছরে ২১ লাখ গোরু পাচার হোত ২০১৫ সালে সেই সংখ্যাটা ৪.৫০ লাখে নেমে আসে। এ বছর গোরু পাচার আরও কম। বিজেবি-র দক্ষিণ-পশ্চিম ক্ষেত্রের ডিরেক্টর মাকসুদ আহমেদ জানান, দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কাছে একটি বড়োসড়ো সমস্যা ছিল সীমান্ত অঞ্চলে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশিদের মৃত্যু। তিনি বলেন, 'আমরা এখন যৌথ অভিযান চালিয়ে এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছি। পাচার বন্ধ করা না গেলে এই মৃত্যুও বন্ধ করা যাবে না।'

বিএসএফের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এ বছর আগস্ট মাস পর্যন্ত তারা মোট ১,১৮,৭১১টি গোরু বাজেয়াপ্ত করেছেন। এইসব গোরু সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পাচার করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

মানবাধিকার কমিশন : কাইরানা মিথ্যে নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিজেপি-সাংসদ হুকুম সিং-য়ের কথাই ঠিক। কয়েক মাস আগে তিনি অভিযোগ করেছিলেন, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের কইরানায় মুসলমানদের অত্যাচারে আতঙ্কিত আড়াইশো হিন্দু পরিবার গ্রামছাড়া হয়েছে। সম্প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তদন্ত- রিপোর্টেও সমর্থিত হয়েছে অভিযোগটি। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২৪ জন সাক্ষীর বয়ান থেকে এটা পরিষ্কার কইরানায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা সংখ্যালঘু হিন্দু মেয়েদের উত্যক্ত করত। রাস্তায় বেরোলেই ভেসে আসত নানারকম কটূক্তি। রাত্রে তো বটেই, দিনেরবেলাতেও তাদের চলাফেরা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া ছিল হিন্দু ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোর করে তোলা আদায়। আসলে নিজের দেশের পুলিশের কাছে যাবার সাহসও হিন্দুদের ছিল না।

সন্ত্রাসের ধাত্রীভূমি পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কিছুদিন আগে নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন পাকিস্তান সন্ত্রাস রপ্তানি করে। ব্রাসেলসের ক্রাইসিস গ্রুপের একটি সমীক্ষা-রিপোর্টেও প্রধানমন্ত্রীর কথার সমর্থন পাওয়া গেল। ‘পাকিস্তানে অবস্থিত জিহাদিদের আঁতুড়ঘর’ শীর্ষক রিপোর্টে পাকিস্তানের দক্ষিণ পঞ্জাবকে জিহাদি তৈরির কারখানা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই এলাকায় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের নিজস্ব আইন-শৃঙ্খলা কায়েম করা হয়েছে। রিপোর্টে প্রকাশ, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুন এখানে প্রযোজ্য নয়। জঙ্গি আইন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দক্ষিণ পঞ্জাব কার্যত নো ম্যানস ল্যান্ডে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে রাজানপুর এবং দেরাগাজিখান জেলার একাংশ, বালুচিস্তানের সীমান্তবর্তী অঞ্চল। এখানকার প্রতিটি মাদ্রাসা ইসলামাবাদের লাল মসজিদের ভাবাদর্শে চালিত। ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত, নরেন্দ্র মোদী ভুল কিছু বলেননি। পাকিস্তান সত্যিই সন্ত্রাস রপ্তানি করে।

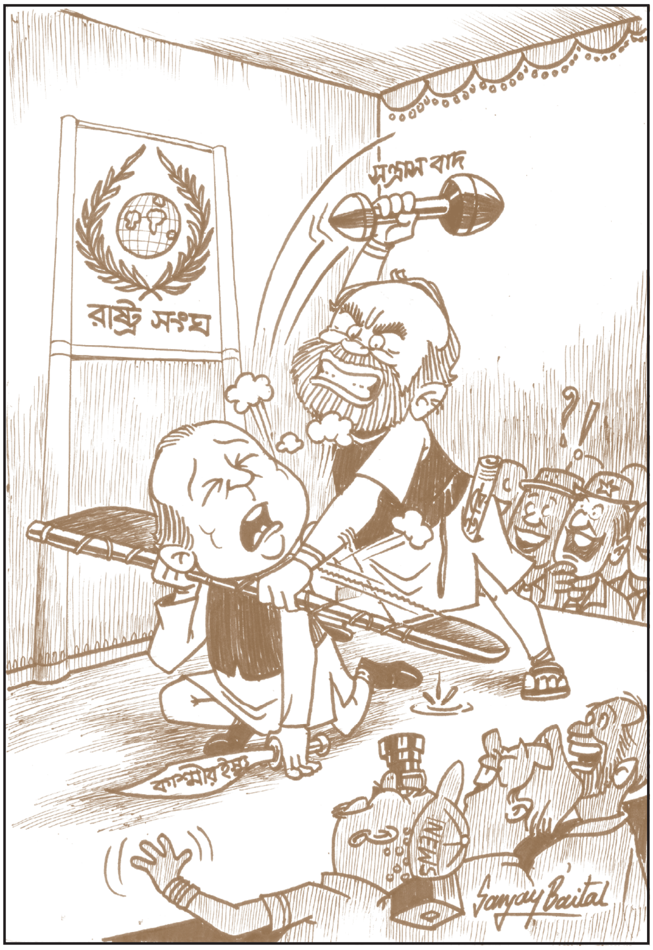

উবাচ

“অতীতের মহান শিক্ষাক্ষেত্র তক্ষশীলা এখন সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে।”

রাষ্ট্রসঙ্ঘে পাক-প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের ভাষণের পর।

ইনাম গম্ভীর
ফার্স্ট সেক্রেটারি,
ভারত সরকার

“পাকিস্তানের অভিযোগ, ভারত বিগব্রাদারের মতো আচরণ করছে। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারও একই কথা বলছেন।”

ত্রিপুরা বিধানসভা অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের সাম্প্রতিক মন্তব্য প্রসঙ্গে।

সুদীপ রায়বর্মন
তৃণমূল বিধায়ক

“সত্য এবং স্বচ্ছতা কতটা অস্বস্তিকর, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কেননা তা মিথ্যার থেকে ভালো।”

বিচারপতি চেলামেশ্বরের মন্তব্য প্রসঙ্গে।

রুমা পাল
সুপ্রিম কোর্টের
প্রাক্তন বিচারপতি

“পাকিস্তানের সঙ্গে ১৯৬০ সালে সিন্ধুজল চুক্তি ভঙ্গ করা সরাসরি যুদ্ধে যাওয়ার চেয়ে অনেক ভাল বিকল্প ব্যবস্থা। এর ফলে পাকিস্তানের গম ও তুলা উৎপাদন শেষ হয়ে যাবে, শুধু আফিংই রয়ে যাবে।”

এক টুইটবার্তায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

তথাগত রায়
ত্রিপুরার রাজ্যপাল

“কাঁচের ঘরে বসে অন্যদের ঢিল ছোঁড়া উচিত নয়।”

রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভাষণে পাকিস্তানের সন্ত্রাস প্রসঙ্গে।

সুষমা স্বরাজ
ভারতের বিদেশমন্ত্রী

মমতা দাও মা দুর্গা

হে মা দুর্গা,

মাগো তোমায় কোনো ঠিকানা ছাড়াই চিঠি পাঠালাম। এখন তো কলকাতা-জুড়ে, বাংলা-জুড়ে তুমি আর তুমি। দশ হাতে দশ অস্ত্র। কিন্তু মা তুমি কি জানো এখানে মানে তোমার বাংলায় এখন অস্ত্র ধরতে পারলেও প্রতিবাদ করা যায় না। প্রতিবাদীর শাস্তি নিশ্চিত করে রাখা হয়েছে।

স্থান, কাল, পাত্র আলাদা। পরিণাম এক। প্রতিবাদের শাস্তিতে প্রহার ও মৃত্যু। কোথাও প্রতিবাদীরা মদ-জুয়ার ঠেক চালাবার বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে, তো কোথাও নারী-নিগ্রহের বিরুদ্ধে। কখনও উত্তর চব্বিশ পরগনার বামনগাছি, কখনও হাওড়ার সালকিয়া, আবার কখনও জলপাইগুড়ির মালকানি হাট। প্রতিবাদীরা কোথাও সদ্য-যুবক, কোথাও বা মাঝবয়সী। দুষ্কৃতীরা সর্ব ক্ষেত্রেই প্রতিবাদীদের হত্যা করছে। ছুরি, ক্ষুর, লোহার রড, এমনকী থান-ইট দিয়ে থেঁতলে মারার ঘটনাও আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রক্তাক্ত অবস্থায় পথে পড়ে থাকা প্রতিবাদীর যন্ত্রণাময় দেহ স্থানীয় প্রতিবেশীরা হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন, যাওয়ার পথে কিংবা যাওয়ার পরেই তাঁদের মর্মান্তিক মৃত্যু। পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের নিরাপাত্তা বহুকাল আগেই লুপ্ত, পুরুষসঙ্গী ছাড়া তাঁদের পথে বাহির হওয়া দিবাভাগেও ঝুঁকির ব্যাপার।

উপরন্তু অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত দুষ্কৃতীরা এত বেড়েছে যে, অপকর্মের যে-কোনো প্রতিবাদই তারা নির্মমভাবে দমন করছে।

এই দুঃশাসনের প্রেক্ষিতটি সহজবোধ্য। পুলিশ নিজে থেকে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করবে, সেদিন নেই। কারণ, পুলিশ এখন দুষ্কৃতীদের ভয় পায়। দল-আশ্রিত দুর্বৃত্তদের ভয়ে কখনও তারা থানার ভিতরেই টেবিলের তলায় ফাইলের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। আর দলীয় ভৈরবরা কাউন্সিলর, পঞ্চায়েত সদস্য কিংবা স্থানীয় দলনেতার নেতৃত্বে একের পর এক থানায় হামলা করে, পুলিশকে পর্যন্ত শারীরিক নিগ্রহ করে, বন্দি দুষ্কৃতীকে থানা থেকে ছিনিয়ে নেয়, প্রশাসনের কর্তা ও কর্ত্রীরা অন্য দিকে চেয়ে থাকেন। পুলিশ নিজেই রক্ষাণাত্মক ভূমিকায়, তাই অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের প্রতিবাদীদের নিরাপত্তা দিতে অক্ষম। এসব অসুরদের সম্পর্কে শীর্ষ আধিকারিকরাও চুপ থাকেন। বলেন 'ফেরার'। অভিযুক্তরা কখনই ধরা পড়ে না, ধরা পড়ার ভয়ও থাকে না, এলাকায় বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

এই হিংস্রতা অতীতেও দেখা গিয়াছে, তবে সেটা প্রধানত রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করেই। সেখানে যুযুধান উভয় পক্ষই যূথবদ্ধ হিংসায় লিপ্ত। এখন কিন্তু সেই অর্থে শাসকদলের কোনো রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীও নেই। নিজেরাই সব। সঅব। তাছাড়া, দুষ্কৃতীরা তো ঝাণ্ডাবাহী হলেও সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী নয়। তাদের তরফে প্রতিবাদীর উপরে চড়াও হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করার তাগিদও নেই। তবু প্রতিবাদীদের কণ্ঠরোধ করতে তারা বাড়তি নির্মমতার আশ্রয় নিচ্ছে। যেখানে কেবল ভয় দেখালেই প্রতিবাদীদের বৃহদংশ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন, সেখানে রাস্তায় ফেলে ইটের ঘায়ে তাঁদের মারার দরকার কী? সেটা কি দৃষ্টান্ত স্থাপনের তাগিদে, যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ প্রতিবাদ করার দুঃসাহস না দেখায়?

এই রাজ্যে যেমন প্রচার তাতে যিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনি যেন আপনারই অংশ। তাঁকেই দেবীজ্ঞানে পূজা করা হয়। তিনি সেসব সহ্য করেন শুধু নয়, বলেন ছোট ছোট ঘটনা। কিন্তু মা দুর্গা, তুমি কি একটু শুভবুদ্ধি দিতে পারো না?

—সুন্দর মৌলিক

চীন নয়, ভারতই নেপালের প্রকৃত বন্ধু

দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত এখন একা নয়। ভারতকে বন্ধুরাষ্ট্র ঘোষণা করে দ্বিপাক্ষিক মৈত্রী স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং সম্প্রতি নেপাল। বিগত তিন দশকের মধ্যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের এতটা উন্নতি দেখা যায়নি। একে মোদী সরকারের অন্যতম বড় সাফল্য অবশ্যই বলা যেতে পারে। বিশেষত, নেপালের সঙ্গে মদেশীয়া ইস্যু নিয়ে ভারতের সম্পর্কের যে টানাপোড়েন গত বছর থেকে শুরু হয়েছিল তার অবসান ঘটাতে কাঠমাণ্ডু যে উদ্যোগ নিয়েছে তাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্বয়ং নরেন্দ্র মোদী। ভারত-নেপাল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে সম্প্রতি চারদিনের ভারত সফরে এসেছিলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকুমার দহল। একদা মাওবাদী এই কমিউনিস্ট নেতা বুঝেছেন যে চীন নয়, ভারতই নেপালের প্রকৃত বন্ধু। তাই মোদীজীর সঙ্গে বৈঠকে তিনি বলেছেন, দরিদ্র পাহাড়ি রাষ্ট্র নেপালের উন্নয়ন প্রকল্পে চীনের সঙ্গে ভারতের পুঁজি বিনিয়োগকে সমান মর্যাদায় স্বাগত জানাচ্ছে নেপাল সরকার। নেপালের বাণিজ্য পথ ভারত এবং চীনের মধ্য দিয়ে গেছে। তাই এই দুই রাষ্ট্রকেই নেপাল বন্ধু হিসাবে পেতে চায়।

দ্বিতীয়বার নেপালের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর পুষ্পকুমার দহল তাই প্রথমেই এসেছেন ভারত সফরে। তিনি ভারতের সঙ্গে তিনটি চুক্তি করেছেন। এই চুক্তির ফলে নেপালের সড়ক ও নির্মাণ প্রকল্পে ভারত মোটা টাকা বিনিয়োগ করবে। এছাড়া ভারত সরকার নেপালকে ৭৫ হাজার কোটি মার্কিন ডলার ঋণ দেবে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর নরেন্দ্র মোদী সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'নেপালের শান্তি, সুস্থিতি ও আর্থিক সমৃদ্ধি আমাদের যৌথ দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। নেপালের উন্নয়ন প্রকল্পে ও অর্থনৈতিক প্রগতিতে শরিক হতে পারাটা আমাদের গৌরবের।' নেপালের নয়া সংবিধানে সেখানের সংখ্যালঘু মদেশিয়া সম্প্রদায়কে নাগরিক অধিকার না দেওয়ায় যে বিতর্ক দেখা দেয় তার প্রতিকার করা হবে বলে

গূঢ় পুরুষের কলম

পুষ্পকুমার দহল স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নয়া সংবিধানে নেপালের সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব ঘটানো হবে। বলেছেন, 'আমার সরকার সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে সবাইকে নিয়ে চলতে চায়।' অথচ এই মদেশিয়াদের নয়া সংবিধানে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ না দেওয়াকে কেন্দ্র করে গত বছর (২০১৫ সাল) ভারত ও নেপালের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছিল। ভারত থেকে নেপালে অত্যাবশকীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ পাঁচ মাস বন্ধ ছিল। এই ঘটনাকে তখনকার নেপালি প্রধানমন্ত্রী কে পি ওলি ভারতের ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ করেছিলেন। ভারতকে শিক্ষা দিতে তিনি সরাসরি চীনের কাছে দরবার করেন যে চীনা শাসকরা অত্যাবশকীয় পণ্য অবিলম্বে নেপালে পাঠাতে দ্রুত পদক্ষেপ নিন। চীনের কাছে সেই দৌত্য ব্যর্থ হওয়ার পর চলতি বছরের জুন মাসে ওলিকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। স্পষ্ট হয়ে যায় যে ভারতই নেপালের লাইফ লাইন, চীন নয়। প্রতিবেশী কূটনীতিতে প্রথম থেকেই নেপালকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন মোদীজী। তাঁর প্রথম বিদেশ সফরের ঠিকানা ছিল কাটমাণ্ডু। কিন্তু গত বছর তাদের নতুন সংবিধান রচনাকে ঘিরে নেপালের সঙ্গে সম্পর্কে তিক্ততা তৈরি হয়েছিল। এর পিছনে ইন্ধন ছিল বেজিংয়ের। নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে নেপালে বসবাসকারী মদেশিয়া ও থারু সম্প্রদায় আদতে ভারতীয় বংশোদ্ভূত। তাই তারা নেপালের নাগরিক অধিকার পেতে পারে না। এটা বিকৃত ইতিহাস। মদেশিয়া এবং থারু সম্প্রদায়ের মানুষজন বহুযুগ ধরে নেপালে বসবাস করছেন। নেপালের সুনসারি, মোরাং, ঝাপা, কাঞ্চনপুর এবং কাইলালি এলাকায় এঁরা বসবাস করেন। হঠাৎ চীনের প্ররোচনার ফাঁদে পা দিয়ে নেপালের সংবিধান রচয়িতারা মদেশিয়া এবং থারু সম্প্রদায়কে ভারতীয় বলে চিহ্নিত করলেন। একবারও চিন্তা করলেন না যে ভারতে বসবাসকারী নেপালি ও গোর্খা সম্প্রদায়কে একই যুক্তিতে নেপালের নাগরিক বলা যেতে পারে। মুসলমানরাও একদা বিদেশ থেকে ভারতে এসেছিল। তাহলে তাদেরও পরদেশি বলে ভারতীয় নাগরিকের মর্যাদা এবং অধিকার কেড়ে নিতে হয়। তবে নেপালের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এমন অন্যায় তিনি হতে দেবেন না। সেটাই বড় ভরসার কথা। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

বিশেষ নিবন্ধ

এবার লক্ষ্য ভারতীয় জাতীয়তার বিকৃতি

এন. সি. দে

বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোরে জাতীয়তাবাদ বিরোধী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে অনমনীয় অবস্থান গ্রহণের কথা বলায় তার বিরুদ্ধে মাঠে নেমে পড়েছেন কর্পোরেট লবি চালিত বৃহৎ দৈনিক পত্রিকাগোষ্ঠীর কেনা জাতীয়তা বিরোধী লেখককুল। এদের কাছে চীনের আধিপত্যবাদী জাতীয়তাবাদ দোষণীয় নয়, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতাবাদী ইসলামি দেশগুলির সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদেও দোষ নেই, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির জাতীয় সংরক্ষণবাদী অর্থনীতির বিরুদ্ধে কথা বলার ক্ষমতাও এদের নেই। এই ধরনের দেশগুলি নিজ নিজ দেশে গোঁড়া জাতীয়তাবাদী, কিন্তু এরাই যখন অন্য দেশে অবস্থান করে তখন এরা সেই ভিন্ন দেশের জাতীয়তাবাদের তীব্র বিরোধিতা করে। যেমন, কমিউনিস্টরা এদেশে ঘোর জাতীয়তা বিরোধী। এরা আমাদের জাতীয়তাবাদকে উগ্র জাতীয়তাবাদ বলে থাকে। এরা খোলাখুলি 'কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালিজমে' বিশ্বাস করে। এরা এদেশের জাতীয় সঙ্গীত গায় না, গায় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল সঙ।

একইভাবে মুসলমানরাও নীতিগতভাবে এদেশের জাতীয়তাবাদের ঘোর বিরোধী। 'ভারতমাতা' জয়ধ্বনি কিংবা 'বন্দে মাতরম্' অর্থাৎ দেশমাতৃকার বন্দনা করাকে এরা ইসলামবিরোধী বলে মনে করে। অমুসলমান দেশকে এরা 'দার উল হারব' অর্থাৎ শত্রুভূমি বলে মনে করে। এরা খোলাখুলিই 'প্যান ইসলাম' অর্থাৎ মুসলমান বিশ্ব গড়ার কাজটাকে পবিত্র কাজ বলে মনে করে।

সাম্রাজ্যবাদীরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত অন্য দেশের জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে ক্ষমতার জোরে নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখত। যেমন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় জাতির শাসন ক্ষমতার সার্বভৌমত্বকে দুশো বছর ধরে নিজ নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে এটা পরিষ্কার যে কমিউনিস্ট, মুসলমান ও সাম্রাজ্যবাদীরা চরিত্রগতভাবে একই অক্ষরেখার বাসিন্দা। এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেশে গোঁড়া জাতীয়তাবাদী কিন্তু অন্য দেশের জাতীয় চরিত্র হরণ করতে এদের জুড়ি মেলা ভার। এরা তাই আধিপত্যবাদী। অন্য দেশের জাতীয়তাবাদী চেতনা ও আন্দোলনকে এরা ভয় পায়। এই কারণে এইসব দেশে এরা নিজেদের পোষ্য সংগঠন, পত্র-পত্রিকা ও বুদ্ধিজীবীদের পোষণ করে যাদের কাজই হলো এইসব দেশের ধর্ম, সংস্কৃতি চেতনা ও জাতীয় পরম্পরা সম্পর্কে মানুষের মনে ঘৃণা ও হীনমন্যতা জাগ্রত করা। এ কাজে এরা দেশের মহাপুরুষদের উক্তিকে বিকৃত করে পরিবেশন করে— যেমনটি করেছে একটি বাংলা দৈনিকে এমনই কয়েকজন পেশাদার লেখক।

সম্প্রতি একটি নিবন্ধে তাঁরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে বিকৃত মোড়কে মানবতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের এক ককটেল তৈরি করেছেন। ভারতীয় মুনি, ঋষি ও মহাপুরুষগণ মানবতাবাদের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা একান্তভাবেই মানবসম্পর্কিত ও বিশ্বজনীন। এটি একটি মানববিজ্ঞান যা ভারত পাঁচ হাজারেরও বেশি বছর ধরে তার অমর কাব্য, সাহিত্য, উপনিষদের চর্চায় অনুসন্ধান ও বিকশিত করেছে। এই মানবতাবাদ আসলে মানবদর্শন যার ভিত্তি বেদান্তদর্শন। সর্বভূতে সমদর্শন। এই দর্শনের কোনো নির্দিষ্ট সীমানা নেই। খ্রিস্টানগণ যে মানবতাবাদের কথা প্রচার করে তা শুধু তাদের ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইউরোপ তাদের সীমানা। তাদের মানবতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ দেশের সীমানায় সীমাবদ্ধ। ভারতের মানবতা তা নয়। এটি বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন।

একটি স্বাধীন জাতির অস্তিত্বের জন্য একটি সার্বভৌম সরকার প্রয়োজন। স্বাধীন জাতির জাতীয়তাবোধ, জাতীয় চেতনা ও তার নিজস্ব জাতির প্রতি দায়বদ্ধতা থাকবেই, কারণ দায়বদ্ধতাহীন জাতির হাতে তার জাতীয় সরকার কখনই সুরক্ষিত থাকতে পারে না। ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যারা বেদান্ত দর্শন ও ধর্মে বিশ্বাসী তাদের নীতি মানবতা। কিন্তু সরকারের নীতি কেবল মানবতাবাদী হলে চলবে না। কেননা সরকারের কাজ হলো তার জাতিকে ও তার জাতীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা করা। ভারতীয় জাতিকে তার প্রতিবেশী আগ্রাসী জাতিগুলির হাত থেকে রক্ষা করাটা যেমন জরুরি ঠিক তেমনিভাবে ভারতের অভ্যন্তরে জাতীয়তা-বিরোধী শক্তিগুলিকে মোকাবিলা করাটাও জাতীয় সরকারের কাজ।

তবে ভারতের জাতীয়তা চীন ও পাকিস্তানের মতো আগ্রাসী কখনই হতে পারবে না যারাই ক্ষমতায় থাকুক না কেন। গত পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনও হয়নি যখন ভারত তার সীমান্ত পেরিয়ে অন্য দেশকে তার নিয়ন্ত্রণে এনেছে এবং দাস বানিয়েছে। এটা অভিনব দৃষ্টান্ত নয় কী? তবে এই উচ্চ আদর্শ এদেশের মানুষকে নিয়ে গেছে এমন এক ভাবজগতে যেখানে কাণ্ডজ্ঞানের বড় অভাব। যেখানে শুধুই আবেগময় রোমান্টিকতা, জাতির অখণ্ডতা রক্ষার তাগিদহীন জীবনদর্শন— যার সুযোগ নিয়েছে উপরোক্ত তিন ধরনের জাতীয়তাবিরোধী শক্তির এদেশি দালালরা।

ইতিহাসকে ভুলে গেলে চলবে না। ভার্সাই চুক্তি তারাই তৈরি করেছিল যারা নিজেরাই ছিল হিংস্র ও ঔপনিবেশিক শোষণের ভাবাদর্শে লালিত। এদেরই লালিত-পালিত শক্তিগুলি আজ ভয় পেয়ে মানবতার বর্ম গায়ে চড়িয়েছে। সাধু সাবধান! এরাই মানবতাবাদের নাম করে কানহাইয়া কুমারদের, ভারতবিরোধী পাকিস্তানপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী কাশ্মীরি যুবকদের পাশে দাঁড়াচ্ছে। আমরা মানবতাবাদী হতে পারি কিন্তু বিজাতীয় নই। তবে এই জাতীয়তা যেন দলীয় নির্বাচনী এজেন্ডায় পরিণত না হয়। মনে রাখতে হবে, জাতীয়তা কেবল একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, অর্থনীতিকেও জাতীয়তামুখী হতে হবে।

চীনের জমি বাড়াবার নীতি ঐতিহাসিক মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে

সুভাষ মোহান্ত

বর্তমান চীনের ভূভাগের আয়তন প্রায় ৯৬ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। রাশিয়া ও কানাডার পরে পৃথিবীর তৃতীয় ও এশিয়ার বৃহত্তম দেশ। স্থল ভাগের দৈর্ঘ্য ২২৮০০ কিলোমিটার। নদী, সামুদ্রিক অঞ্চলের আয়তন ৩ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৫০০০ দ্বীপ রয়েছে। বর্তমান চীন এক বিশাল ভূখণ্ডের অধিকারী। আগে কোনো কালেই চীনের এই ভূভাগ ছিল না। চীন জমি বাড়িয়েই চলেছে। ১ অক্টোবর ১৯৪৯ সাল। মাও-সে-তুং গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার পরে চীন জমি বাড়িয়েই যাচ্ছে। এই জমি বাড়ানো কখনো স্বেচ্ছায় হয় না। আপনি যদি আপনার প্রতিবেশীর সীমার মধ্যে নিজের জমি আছে বলে দাবি করেন, সেই দাবির মীমাংসা না করেই জবর দখল করে বসেন, তাতে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় চীনের ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। চীন স্রেফ গায়ের জোরে আন্তর্জাতিক নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে সেই মধ্যযুগীয় চিন্তা ভাবনা নিয়ে চলছে।

চীনের প্রতিবেশী দেশগুলি হলো, উত্তরে— মঙ্গোলিয়া, রাশিয়া। উত্তর পশ্চিমে--- কাজাকিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরঘিজস্তান। দক্ষিণ পশ্চিমে— পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ভারত, দক্ষিণে— ভারত, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার, লাওস, ভিয়েতনাম। দক্ষিণ পূর্বে— ফিলিপাইন, ব্রুনেই, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া। পূর্বে জাপান। উত্তর পূর্বে— দুই কোরিয়া ও রাশিয়া।

প্রতিবেশী অন্য দেশগুলো বিভিন্ন কারণে চীনকে ভয় পায়। যেমন—১. একনায়কতন্ত্রী চীন (নামে গণপ্রজাতন্ত্রী) কোনো আদর্শের ধার ধারে না। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যা ভালো তাই চীনের আইন। সেই আদর্শ ও আইন অন্যের উপর চাপাতে চায়। ২. অস্ত্র শক্তিতে এশিয়ায় একমাত্র রাশিয়া চীনের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে। ভারত কিছুটা, যদিও কয়েক যোজন পিছিয়ে। সেনাবলে চীনের সমকক্ষ কেউ নেই। ৩. অর্থবলে জাপান চীনের সমগোত্রীয় কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জাপান অস্ত্রসজ্জায় বিশেষ অর্থ বিনিয়োগ করে না। ৪. লাওস, ভিয়েতনাম, নেপাল, ভুটান, তিব্বত, মায়ানমার, তাজিকিস্তান, ফিলিপাইন, ব্রুনেই অতি ক্ষুদ্র শক্তি জো-হুজুরের দলে।

মাও-সে-তুং ও পরবর্তী কমিউনিস্ট শাসকরা জমি বাড়িয়েই যাচ্ছিল। কিন্তু তা নিয়ে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হলেও কোনো কিছুতে চীন কর্ণপাত করেনি। সম্প্রতি চীন জাপানের একটা আস্ত দ্বীপই নিজেদের বলে দাবি করলো, শুধু তাই নয়, জাপান-সহ অন্তর্জার্তিক বাধা নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে ওই দ্বীপে যুদ্ধজাহাজ, ক্ষেপণাস্ত্র- সহ সেনাবাহিনী পাঠালো। সঙ্গে দাবি করলো দক্ষিণ দরিয়ার একচ্ছত্র অধিকার একমাত্র চীনের। দক্ষিণ দরিয়ায় কৃত্রিম দ্বীপ গঠন, তেল উত্তোলন, যুদ্ধজাহাজের টহল জোর কদমে শুরু করলো। ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, ব্রুনেই, জাপান-সহ অন্য দেশগুলোর সঙ্গে সরাসরি টক্কর লাগলো। ভয় দেখানো, দাবড়ানি দেওয়া, অন্য দেশের জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়ার ঘটনাও চলতে থাকলো। এতে ভীত সন্ত্রস্ত ছোট দেশগুলো আন্তর্জাতিক বিচার সভার কাছে দক্ষিণ দরিয়ার অধিকার ফেরত পাওয়া নিয়ে নালিশ জানালো। জুলাই ২০১৬ আন্তর্জাতিক আদালত স্পষ্ট রায় দেয়— 'দক্ষিণ সাগর কখনোই চীনের একক সম্পদ ছিল না, এখনো নেই'। আন্তর্জাতিক আদালতের রায় চীন এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বলে 'আমরা এই রায় মানি না' এবং এতটাই ঔদ্ধত্য, ওই বিচার সভায় অন্যান্য দেশের প্রতিনিধি থাকলেও চীন কাউকে ইচ্ছে করেই রাখেনি। অথচ চীন নাকি দায়িত্বশীল রাষ্ট্রপুঞ্জের পাঁচ স্তম্ভের এক স্তম্ভ। যার অঙ্গুলিহেলনে (ভেটো) ভারতের আন্তর্জাতিক ইউরেনিয়াম পরমাণু সংগ্রহের রাস্তা বন্ধ হতে সময় লাগে না।

চীনের এই আগ্রাসন নীতির ভিত্তি হলো— ১. চীন ওয়াঙ্গ গঙ্গ-য়ের কিতাব 'দ্য নান হাই ট্রেড'কে আকর গ্রন্থ জ্ঞান করে। যেখানে 'নান হাই' মানে দক্ষিণ সমুদ্র চীনের বলে উল্লিখিত। ২. দক্ষিণ চীন সমুদ্রের ৩৫ লক্ষ বর্গমাইলে একমাত্র চীনের অধিকার, অন্য দেশ অচ্ছুত। কারণ জাভা সমুদ্র ও বেলিতং দ্বীপের কাছে নবম শতকের এক চীনা জাহাজের ভগ্নাবশেষ মিলেছে যা প্রমাণ করে ওই সমুদ্র চীনের অধিকারে ছিল। ৩. ভাস্কো-দা-গামার ভারত আগমনের আগে চীন শাসক জাং হা (জাং হে) (১৪০৪-১৪৩৩) প্রায় তিন দশক ধরে সমুদ্র শাসন করেছে। এর আগে কারোর এই কৃতিত্ব নেই বলে চীনের দাবি। ৪. ভারতের উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ক্ষেত্রে নাক চ্যাপ্টা, একই রকম শারীরিক গঠনের মানুষের বাসক্ষেত্রগুলো সব বৃহত্তর চীনের অংশ। যেমন ভারতের সিকিম, অসম, অরুণাচল প্রদেশ। এসব অংশে একমাত্র চীনের অধিকার। পশ্চিম তিব্বত, উত্তর পশ্চিম ভারতের ক্ষেত্রে অন্য কারণ। কারণটা এই প্রথম খ্রিস্টাব্দে পূর্ব হান সম্রাট মিং ও জাং তার সেনাপতি বান চাও পামীর মালভূমি ভেদ করে ক্যাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। কিছুকাল ওই অঞ্চলে মিং ও জাং-য়ের কর্তৃত্ব থাকে। যেহেতু চীনারা এই বিশাল ভূভাগ কোনো এক সময় দখল করেছিল সুতরাং এই অঞ্চলে এখনো চীনাদের অধিকার আছে। ৫. ১৪১১ সালে চীনা জলসেনা শ্রীলঙ্কার শাসককে বন্দি করে চীন পাঠায়, সুতরাং এই জলপথ ও দেশ সমূহের উপর চীনের প্রভূত্ব বর্তমান।

ঘটনা হলো, চীনের এই আগ্রাসন নীতির পক্ষে কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না। ১. খ্রিঃ পূর্ব ২২০০ সালে সিয়া রাজবংশ। খ্রিঃ পূর্বাব্দ ১৬০০-১৪০০ সাং রাজবংশ। খ্রিঃ পূর্ব ১০৪৫-২৫৬ অব্দ চৌ রাজবংশ। ২২১-২০৬

খ্রিঃ পূর্বাব্দে কীন রাজবংশ। ঝিন্ রাজবংশ। হান রাজবংশ। সুই রাজবংশ। তাং রাজবংশ (৬১৮-৯০৭ খ্রিঃ)। মিং রাজবংশ (১৩৬৮-১৬৪৪ খ্রিঃ) এবং সর্বশেষ কীং রাজবংশ (১৬৪৪-১৯১১)। কোন চীনা রাজার আমলে চীনের এত ভূভাগ ছিল? ২. চীন যদি এত বড় দেশ, তাহলে রাজা শি হুয়াং (২২১-২০৬ খ্রিঃ পূঃ) কেন দেশকে তাতার বা মোঙ্গলদের হাত থেকে বাঁচাতে মহা পাঁচিল (চীনের প্রাচীর) দিয়েছিলেন। ৩. নাক চ্যাপ্টা শারিরীক গঠন যদি মাপকাঠি হয়, তাহলে এশিয়ার একটা বড় অংশের মানুষ তো নৃতাত্ত্বিক ভাবে অস্ট্রোমোঙ্গলয়েড। দাবি তো অস্ট্রেলিয়া, মোঙ্গলিয়ার হওয়া উচিত, চীনের কেন? ৪. জাপানের দ্বীপ কবে চীনের হলো? তাহলে (১৯৩১-৪৫ চীন জাপান যুদ্ধ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান চীনের তিনটি বড় রাজ্য দখল করে নিয়েছিল; তাহলে ওই দখল করা অংশও তো জাপানের হতে হয়। ৫. দক্ষিণ সমুদ্রকে কম্বোডিয়া তো চম্পা সমুদ্র (চম্পক দেশ) বলে। ভিয়েতনাম পূর্ব সাগর বলে। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এই জলরাশিকে বিয়েন দঙ্ বলে। ফিলিপিন্স পশ্চিম ফিলিপিন্স সাগর বলে। স্ব স্ব দেশের মানচিত্রেও প্রাচীনকাল থেকে একই শব্দ রয়েছে। দক্ষিণ চীন সাগর চীনের হলে অন্য দেশের জলপথ কোথায়? ৬. ১৪৩৩ সালের পরে চীনের নৌবহর দাপট অদৃশ্য হয়ে যায়। ইউরোপীয় নৌবহরের দাপট তখন শুরু হয়। তাহলে ইউরোপ তো চীনকে, চীনের উপসাগরকে স্ব সাম্রাজ্য বলতে পারে। ৭. সম্প্রতি দক্ষিণ চীন সাগরে বিপুল গ্যাস, তৈল ভাণ্ডারের হদিশ মিলেছে। এর মোহেই কি চীনের ইতিহাস অস্বীকার করে গা-জোয়ারি জমি, জল দখল নীতি? ৮. মানস সরোবর, কৈলাস পর্বত তো হিন্দু তীর্থ। এ জায়গা কবে চীনের ছিল? চীনা পুরাণ কেন মূক? ৯. ১৯৯৭ সালে ব্রিটেনের কাছ থেকে চীন হংকংয়ের নিয়ন্ত্রণ নেয়। পর্তুগাল ১৯৯৯ সালে ম্যাকাওকে চীনের কাছে হস্তান্তর করে। জায়গা দুটি এখনো স্বায়ত্ত শাসন ভোগ করছে। চীনের যদি হবে তাহলে স্বায়ত্ত শাসন কেন? ১০. চীনে হান জাতি ছাড়াও মোঙ্গল, উইঘুর, তিব্বতি, হুয়াং, মিয়াও-সহ ৫০-এর উপরে জাতি রয়েছে। এরা হানদের অধিপত্য সহ্য করে না। জাতিভিত্তিক খণ্ডিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ তো চীনের বরাবরের ইতিহাস। বিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত তাই তো দেখা গেল নাকি?

চীনের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি হলো দ্বিচারিতা। ১. স্বাধীন ও স্বাতন্ত্র্য নীতি অনুসরণ। বড় দেশের সঙ্গে মিত্রতা না করা। অস্ত্রসজ্জা, সামরিক সম্প্রসারণ ও অস্ত্র প্রতিযোগিতায় না যাওয়া। পরস্পরকে সম্মান প্রদান। এর ফলশ্রুতি— বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার গঠন করে চীন বিদেশে অস্ত্র বিক্রি। লালফৌজ নামে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সেনাবাহিনী গঠন করেছে। ২. আধিপত্যবাদের বিরোধিতা করা। বিশ্বশান্তি রক্ষা করা। শক্তিশালী বা দুর্বল, ধনী বা গরিব সব দেশের একই মর্যাদা প্রাপ্তি। বল প্রয়োগ, হুমকি কোনো অজুহাতে অন্যদেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করা। এর ফলশ্রুতি— ১৯৬২ সালে এক তরফা যুদ্ধে ভারতের ৪০ হাজার বর্গ কিলোমিটার জমি দখল করে রেখেছে চীন। এছাড়া আকশাই চীন দখল, তিব্বত দখল, হংকং, ম্যাকাও, তাইওয়ান দখল, প্রায় দু-হাজার দ্বীপভূমি দখল। অরুণাচল, সিকিম, উত্তর পূর্ব কাশ্মীর নিয়ে ভারতকে বার বার হুমকি। ৩. পরস্পরের অখণ্ডতা রক্ষা, পারস্পরিক অনাক্রমণ, ন্যায় ও যুক্তিযুক্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতি, অর্থনীতি শৃঙ্খলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এর ফলশ্রুতি— চীনের জাপানের দ্বীপ দখল, দক্ষিণ দরিয়া দখল। ৪. পঞ্চশীল নীতির ভিত্তিতে সকল দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণই নীতি। ভারত, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম, ব্রুনেই, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মায়ানমার-সহ বহু দেশকে গা-জোয়ারি ভয় দেখিয়ে কাঁটা করে রাখা। প্রসঙ্গত, এরকম শান্তির বাতাবরণ রক্ষাকারী চীনকে আমাদের দেশের বিশেষ এক রাজনৈতিক দল নির্লজ্জভাবে সমর্থন করে। ৫. সার্বিক ভাবে, পারস্পরিক উপকারিতার নীতির ভিত্তিতে, বৈদেশিক উন্মুক্তদ্বার নীতি গ্রহণ, বাণিজ্য, সংস্কৃতি, কারিগরী, বিজ্ঞান যোগাযোগ ত্বরান্বিতকরণ। বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক তৎপরতা, বিশ্বশান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান লক্ষ্য। চীন সব দেশের সঙ্গে উন্মুক্ত বাণিজ্য করবে একতরফা ভাবে কিন্তু অন্য দেশের জন্য চীনের দরজা লাসা'র মতো নিষিদ্ধ। আসলে আধুনিক চীনের ধর্মই হলো বর্তমানের প্রয়োজনে ইতিহাসকে ব্যবহার ও অপব্যবহার করার প্রবণতা। এই প্রবণতা সব রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই দেখা যেতে পারে। যদি সেই রাষ্ট্র ক্রমে অর্থ ও অস্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে উঠতে থাকে।

ধর্ম, ভাষাগত ঐক্য, ভৌগোলিক ঐক্য, বাণিজ্যিক ঐক্য, জনসংযোগ ঐক্য, সহ বেশ কিছু কারণ দেশসীমা নির্ধারণের কারক হয়। চীন আগে এসব মানতো, এখন মানেই না। মিথ্যে অহঙ্কার, বলদর্পে দর্পি চীনা শাসকদের মতো এরকম অসংখ্য শাসক ও সাম্রাজ্য পৃথিবীর ইতিহাস দেখেছে। হজরত পরবর্তী মুসলমান খলিফারা, ভুবনজয়ী আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, ফ্যুয়েরার, সর্বশেষ বিশ্বজয়ী ব্রিটিশ বা রাশিয়ার কমিউনিস্ট শাসকরা কেউ তাদের প্রভুত্ব দীর্ঘকাল কায়েম রাখতে পারেনি। এখন দেখার চীন কতদিন ম্যাকাও, হংকং, তাইওয়ান, উইঘু অধ্যুষিত অঞ্চল, তিব্বত ধরে রাখতে পারে। চীনের আবার না রাশিয়ার পরিণতি হয়! অথবা এশিয়ায় না আবার ভয়ঙ্কর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়! বিষয়টা অনাগত ভবিষ্যতের উপর ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই।

দর্প, অহঙ্কার, অভিমান, ক্ষমতার অতি মোহ কোনোটাকেই 'কাল' দীর্ঘমেয়াদি ভাবে গ্রহণ করে না।

(লেখক একজন গবেষক)

ভারতমাতার পূজাই প্রকৃত দুর্গাপূজা

স্বামী বিষ্ণুপুরী মহারাজ

মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুক ভট্টের পুত্র রাজা কংস নারায়ণ। তাঁর নিবাস ছিল রাজশাহী জেলায়। তিনিই সর্ব প্রথম এক কাঠামোতে মহিষমর্দিনী মাতা দুর্গার পূজা করেছিলেন। মাতা দুর্গার প্রতিমা মাঝখানে। তিনি দশভুজা দশপ্রহরণধারিণী অর্থাৎ তিনি তাঁর ভক্ত সন্তানগণকে দশদিক থেকে রক্ষা করে থাকেন। তাঁর ভক্তগণের কোনোকালেই দুর্গতি হয় না।

'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি' (গীতা—৬/৪০)

কৃত্তিবাসী বাংলা রামায়ণে পাওয়া যায় যে, রাবণ বধের পূর্বে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র নয়দিন ধরে দুর্গাপূজা করেছিলেন। আর সেই থেকেই ভারতে শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রচলন।

কাঠামোর বামদিকে দেব-সেনাপতি কার্তিক ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর মূর্তি। ডানদিকে ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী ও শৈলজা-নন্দন গণপতি গজাননের মূর্তি। মা দুর্গা সিংহবাহিনী হয়ে মহিষাসুরকে বধ করছেন— সেই অপরূপ মূর্তি মধ্যমণি হয়ে বিরাজিত।

কাঠামোর ডানদিক থেকেই আমি আমার ব্যাখ্যা লিখতে আরম্ভ করছি—

সর্বাগ্রে গণেশের পূজা। তিনি গণদেবতা। জনগণ-অধিনায়ক। তাই তাঁর বর্ণনা আগে করণীয়।

মূর্তির মধ্যে রহস্য নিহিত। গণেশের মাথাটি হাতির মাথা। পরিকল্পনামতো একজন গণ-নায়কের মস্তিষ্ক ক্ষুদ্র হলে চলে না। হাতির মাথার মতো বড় মাথা প্রয়োজন। তাঁর কানও হাতির কানের মতো বিরাট। একটি হাতি ২০ কিলোমিটার দূরবর্তী অন্য একটি হাতির সঙ্গে তাদের সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা বলতে পারে। যারা গোপনে শত্রুপক্ষের বা শত্রুদেশের গুরুত্বপূর্ণ খবর সংগ্রহ করে, সেই গোয়েন্দা- বাহিনীর কাজ করে মা লক্ষ্মীর পেচক, কার্তিকের ময়ূর। রাজা গুপ্তচরের চোখেই দেখেন ও শোনেন। রাবণের গুপ্তচর ছিল শুক ও সারণ। তারা ছিল মায়াবী। তাই তারা রূপ বদলে ফেলতে পারত। আজকাল সেই কাজটা হয় ড্রোনের মাধ্যমে।

পৃথিবীটা বেশ বিশাল, তাই স্বদেশে বা বিদেশে সরকারের বিরুদ্ধে কোথায় কী গোপন ষড়যন্ত্র হচ্ছে, সেটা জানার জন্য রাষ্ট্রনায়কের হাতির মতো লম্বা শুড়ের প্রয়োজন এবং চতুর্দিকের ঘটনাবলীর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাও সেই সঙ্গে থাকা চাই।

মাথা অনুপাতে হাতির চোখ ছোট। বিশালাক্ষী হলে তাকে দেখতে ভাল লাগে। কিন্তু ক্যামেরার লেন্সের অ্যাপার্চার বড় থাকলে ছবি হবে অস্পষ্ট। ফটো রিপোর্টাররা তাই খুব ছোট অ্যাপার্চারে ছবি তুলে পাঠান। গণপতি গণেশের পেট 'বৃকোদর' নয়, বরং লম্বোদর— 'লম্বোদরঃ গজাননঃ'। তার মানে সমগ্র রাষ্ট্রের ক্ষুধার্ত নাগরিকদের পেট তাঁকে ভরাতে হবে। কোনো নাগরিক যাতে রাত্রে অনাহারে নিদ্রা না যায়।

গণপতি গণেশ লাড্ডু খেতে ভালবাসেন— মোদকপ্রিয়ঃ গজাননঃ। আর তার গণ শুখা রুটি খাবে, তা চলে না। তাই রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক যাতে ভাল খেতে পরতে পায়, তার ব্যবস্থা রাষ্ট্রনায়ককে করতেই হয়।

দেবী লক্ষ্মী দুর্গারই আর এক রূপ। যে রাষ্ট্রের প্রজারা নির্ধন, তারা দুশ্চরিত্র হয়ে ওঠে। তাই রাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী মা লক্ষ্মী নাগরিকদের আয়ের পথ পরিষ্কার করেন। তাঁর বাহন পেচক রাত্রি জেগে পাহারা দেয় যাতে কেউ চোরা পথে আমদানি রপ্তানি না করতে পারে। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ'। যাতে কলকারখানার উৎপাদন ভাল হয়, বিশ্বমানের হয়, তা সুনিশ্চিত করা মা লক্ষ্মীর কাজ।

সরস্বতী— বাণী বিদ্যাদায়িনী। বিদ্যাদেবী হলেন এডুকেশন মিনিস্টার। যে রাষ্ট্রের নাগরিকেরা সব অঙ্গুঠা ছাপ, বিশ্বে কোথাও তাদের কোনো মানসম্মান নাই।

বিদ্যা দুই প্রকার— পরা ও অপরা। অপরা মানে সাহিত্য, গণিত, জ্যোতিষ, ভূগোল, খগোল, অন্তরীক্ষ ইত্যাদি জাগতিক বিদ্যা। কেবল জানা নয়, আবিষ্কার করা। এই অর্থে মাতা সরস্বতী সর্ববিদ্যা। তিনি পরা বিদ্যারও অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পরা বিদ্যার অর্থ ব্রহ্মবিদ্যা। জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নতার জ্ঞান লাভ করা। সরস্বতী শ্বেতা, ধবলী অর্থাৎ নাগরিকগণের জীবনে যাতে তমোগুণ হ্রাস পায়, সেই বিচার ক্ষমতা নাগরিকদের মধ্যে উৎপন্ন করাও বিদ্যারই অবদান।

সরস্বতীর বাহন হংস। হংস জলে সাঁতার কাটে কিন্তু গায়ে জল লাগে না। 'পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।' জ্ঞানী পুরুষরাও এই সংসারেই বিচরণ করেন। কিন্তু তাঁরা হংসবিদ্যা লাভ করে পরমহংস সন্ন্যাসী হয়ে থাকেন।

কার্তিক দেব-সেনাপতি। তাঁর উপর দৈবী সম্পত্তির সুরক্ষার দায়িত্ব। সারা বিশ্বে বর্তমানে আসুরী অসভ্যতার প্রকোপ সীমা ছাড়িয়েছে। সন্ত্রাসবাদ, আই এস আই এস বেড়েছে। কিন্তু তাদের চরম বিজয় কোনোকালেই হয়নি, হবেও না। কারণ 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'। সত্যেরই জয় হয়, অসত্যের হয় না।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে ভারতমাতাকে সিংহবাহিনী জগদম্বিকার রূপে ধ্যান করেছেন। সেই মন্ত্র জপ করে তাঁর সন্তানগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে বলি হয়েছেন। দু'চার জন মুসলমান যারা স্বাধীনতা- সংগ্রামী হয়েছিলেন, তারা ভারতকে মাতৃজ্ঞানে নয়, বরং ভারতের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ বা তাঁর বংশধরদের শাসক রূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন।■

‘মোর অনুভবে তুমি মা দুর্গে’

ড. তুষারকান্তি ঘোষ

ভারতবর্ষ দেবী সাধনার দেশ। ভারতবর্ষের প্রতিটি ধূলিকণা দেবী মাহাত্ম্যে প্রতিভাসিত। ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে অজস্র শক্তিপীঠ। এইসব শক্তিপীঠ দেবী সাধনার তপস্যাভূমি। পৌরাণিক উপাখ্যানে দেবী সতীর দেহত্যাগের কাহিনি বর্ণিত আছে। দক্ষরাজের যজ্ঞবেদীতে দেবীর আত্মাহুতি প্রদানে ক্রুদ্ধ শিব যখন সতীর দেহ নিয়ে তাণ্ডবলীলা করছেন তখন বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে দেবীর খণ্ডিত অংশ বিভিন্ন স্থানে পতিত হয়েছিল এবং গড়ে উঠেছিল এক একটি শক্তিপীঠ। এই শক্তিপীঠগুলোকে বিন্দু দিয়ে যোগ করলে যে চিত্র ভেসে উঠে তা হলো দেশমাতৃকা ভারতজননীর। এক বিদেশিনী মহিলা ভারতবর্ষের পৌরাণিক কাহিনির উপর গবেষণা করতে এসে বললেন, “State is nothing but Mother India is personified.” ভারতবর্ষের এই ধর্মভূমিতে দেবীর চিন্ময়ীসত্তা কী অপূর্ব ভাবে মিশে গেছে!

দেবীর বিভিন্ন নাম, দেবীর বিভিন্ন রূপ। দেবীপুরাণে দেবীকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে— ভদ্রা, মঙ্গলা, শ্রী। উমা এঁরা হলেন সাত্ত্বিকীদেবী। ব্রাহ্মী, গৌরী, বিমলা, দুর্গা এঁরা হলেন রাজস্ রূপের দেবী। কালী, মাহেশ্বরী, কুমারী, চণ্ডিকা— এঁরা হলেন তমোগুণের দেবী।

এইসব দেবীই তো দিব্যধামবাসিনী। তবে তাঁরা এই মর্ত্য পৃথিবীতে এলেন কেন? দেবীর মর্ত্যধামে নেমে আসার কারণ হলো সন্তানের প্রতি তীব্র ভক্তি। এই ভক্তির পরিমণ্ডলে দেবীকে সন্তানেরা আরাধনা করেছেন দুটি দৃষ্টিতে— একটি দার্শনিকের, অপরটি সাধকের। দার্শনিক দৃষ্টিতে বহু বিচার করে দেবীর সত্তা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর সাধকের দৃষ্টিতে দেবীর বিভিন্ন রূপের মধ্যে একই সত্যকে উপলব্ধি করা হয়েছে।

দুই

সন্তান দেবীকে আহ্বান করলেন বিভিন্ন কারণে। (১) মানুষের জীবনে দুঃখকষ্টের শেষ নাই— দুর্গতির শেষ প্রান্তে যেন মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে। তাই সন্তান বলল— মা, তোমার পূজার আয়োজন করেছি, তুমি এস— ‘এহি প্রেহি প্রতিক্ষয়ম’। তোমার পূজার কামনায় আমরা উদগ্রীব, তাই মা গো, এসো আমাদের কাছে— ‘এহি মনুর্দেব যুযজ্ঞ কাম’। ঘরে ঘরে তোমার পূজার আয়োজন করেছি জননী, তাই তোমাকে অসতেই হবে, আমাদের হৃদয়-মন-প্রাণে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে— ‘এ হি মে প্রাণান্ আরোহ’। (২) আমাদের জীবন তো শুধু খাওয়া দাওয়া আর ভোগ বিলাসের কাল কাটানো নয়। স্বর্গীয় দিব্যলোকের মহত্ত্ব প্রাপ্তি আমাদের জীবনের লক্ষ্য। এছাড়া তো গতি নেই! জীবনে উচ্চ আদর্শের জন্যই তো মাগো তোমার সাধনা। মহত্ত্বের পথে আমাদের নিয়ে চল— ‘সুগম পথ দেব যানান।’ (৩) তুমি জননী, তুমি দেবী, তোমা ছাড়া আর কার শরণাগত হবো? তুমি জননী, কল্যাণময়ী। কল্যাণের পথই দেবযান। সে পথ তো তুমিই দেখাবে। মায়ের নাম ছাড়া সন্তানের আর আছেই বা কী? —‘দেবী জনিত্রী’, ভদ্রা জনিত্রী, অম্বা নামসি’। (৪) হে জননী, এই পৃথিবীতে তো প্রথমেই শক্তি জন্মগ্রহণ করল। সেই শক্তিকে যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করে কল্যাণের পথে নিয়ে এলেন তারাই তো দেবতা হলেন। আর যাঁরা শক্তিকে লাভ করে জগতে অকল্যাণ করতে শুরু করলেন তারাই হলেন অসুর। এই দেবাসুরের সংগ্রাম, কল্যাণ অকল্যাণের সংগ্রাম তো নিত্য চলেছে সংসারে— ‘তে এষু লোকেষু অসার্ধন্ত’। মা গো— তুমিই শক্তিরূপা, আবার কল্যাণরূপা। তোমার শক্তি সর্বত্রই প্রকাশিত। তুমিই শক্তিকে বিস্তারও করতে পার— ‘ওজোহস বলমসি সহোহসি যকানি’। এই অসুরকুল হতে তুমিই তো আমাদের রক্ষা করবে। তোমার সন্তানকে এই যুদ্ধে যোগ্য করে তোলো।

তিন

সন্তানেরা দেবীর কাছেই কেনই বা এই কামনা করল? যেদিন সন্তানেরা এই ধরিত্রীতে জন্মগ্রহণ করেছিল, এই ভূমিতেই প্রতিপালিত হয়েছিল সেদিন বিশ্ব প্রকৃতির রূপ দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। সন্তানেরা এই রূপকেই মাতৃশক্তিতে আরাধনা করল। জননীর রূপ দেখে তারা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল— ‘যদীক্ষে তদ বনন্তি মা’— যেদিকে তাকাই সেদিকেই তোমার রূপে আমি মুগ্ধ জননি!’

হে জননী! সোনার বরণ রৌদ্রময়ী তোমার আঁচলখানি, অথচ শ্যামল স্নেহময় তোমার কোলটুকু ‘অগ্নিবাসা পৃথিবী অসিতজ্ঞু।’

মাগো, আমি স্বর্গ চাই না, দেবলোক চাই না। তোমার অপূর্ব প্রেম সৌন্দর্যে ভরা

কোলখানিই আমার পরমলোক। হে জননী! তুমি আমাকে তোমার সেই প্রেমলোকেই সুপ্রতিষ্ঠিত রাখ— 'ভূমে মাতা নিধেহি মা ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্'। আমি জানি তুমিই আমাকে সকল দিব্য সমাজে পূর্ণ করবে, তুমিই আমাকে সকল শ্রী ও বৈভবের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে— 'সং বিদা না দিবা কবে শ্রিয়াং মা ধেহি ভূত্যাম'।

সভ্যতার ঊষালগ্ন তখনও পৃথিবীতে আসেনি। সেই প্রত্যুষে আমাদের ঋষিকুল, সাধককুল জননীকে কী অপূর্বভাবে দেখেছেন। মাতৃসাধনায় আকুতিতে সন্তানের জীবন কীভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এই মাতৃ আহ্বান বিশ্বের আর কোথাও কোনো সাহিত্যে দেখা যায় না। ভারতবর্ষ এই সাধনার ধারক ও বাহক। এই আদ্যাশক্তি পরা প্রকৃতিকে ভারতের সাধকেরা জননীরূপেই সম্বোধন করেছেন। শুধু তফাত দেখা গেল বাংলায়— এখানে জননী কন্যা রূপেও সম্বোধিত হলেন। কখনো কালিকা রূপে, কখনো শারদা রূপে, কখনো বাসন্তীরূপে। সকলেরই তিনি জননী, আবার সকলেরই তিনি কন্যা। কন্যা ষষ্ঠীতে আসবে, দশমীতে ফিরে যাবে। বাংলার ধর্মীয়, গার্হস্থ্য, সংস্কৃতি ও সাধনার জগতে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী--- বিশাল ঐতিহ্য সংবলিত আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞায় পূর্ণ।

চার

মা মহামায়ার পুজো যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। চারদিনের জন্য। তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের কালক্রমে মাত্র চারদিন। এটি মায়ের পুজো না জীবন সাধনা ঠিক বোঝা যায় না। আলো আর বৈভবময় সাজসজ্জায় মায়ের আগমনের ভাবনাটার খেই হারিয়ে যায়। অজস্র বিজ্ঞাপন আর প্রচারে দেখা যায় সপ্তমী থেকে দশমী অবধি বেশভূষা, অলংকার বিভূষণ, খাদ্যরুচির বর্ণময় পদের সঙ্গে দেহ সৌন্দর্যের বাহার।

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবি— এই চারদিন তো ভোগ- বিলাসের নয়। এই চারদিন তো প্রতীকী জীবন। মানুষের জীবনের চারটি স্তর আছে— দেহ, মন, বুদ্ধি, আত্মা। একটি স্তর হতে অপরটি স্তরে উত্তরণের মধ্য দিয়েই লুকিয়ে আছে মানুষের জীবনের পূর্ণতা। পুজোর উৎসবে সপ্তমী হলো দেহ। মানুষ কিন্তু দেহের সুখেই সন্তুষ্ট থাকল না। মনকে আবিষ্কার করলো অষ্টমীতে— মনের মধ্যেই বিশ্বচরাচর নিহিত। মনেই আছে দেবাসুর। দ্বন্দ্ব তাই মনে। নবমীতে সে অনুভব করলো মন পরিচালিত হয় বুদ্ধি দিয়ে (এর মধ্যে নিহিত জ্ঞান, প্রতিভা ও ভক্তি)। দশমীর দিনে বিসর্জনের পূর্বে মানুষ চিনল তার আত্মাকে— ওই বিজয়াদশমী বিসর্জন নয়— আত্মার সঙ্গে দেবী মহামায়ার মিলন— আমি যে মহামায়ারই অংশ, তাই বিসর্জন কিসের? বৈষ্ণব দর্শনের অভিব্যক্তির মতো--- 'Becoming one with God–self mergence in the principle of love and life.' মানুষ ওই Love এবং Life টা তাঁর চরণে সমর্পণ করছে কিনা সেটা দেখার জন্যই মা আসেন।

পাঁচ

মা মহামায়ার সান্নিধ্যে কেটে যায় এই ক'টাদিন। যেন তিনি স্নেহের উষ্ণ পরশের বারি সিঞ্চন করে হৃদয়টাকে সতেজ করে দিয়ে যান। আমরা তো সন্তান, তাই মায়ের কাছে আমাদের চাওয়ার তো অন্ত নেই— 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি...'। এই চাওয়া তো শ্রীশ্রী চণ্ডীর অর্গলা স্তোত্রে লিপিবদ্ধ আছে। অর্গলা স্তোত্রের উচ্চারণকারী সাধক তো এই বিশ্বের মোহ মায়া কামনা বাসনা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নিয়ে নিজেকে অর্গলবদ্ধ করে রেখেছেন— যেখানে আছেন শুধু মা মহামায়া আর সাধক। অর্গলা স্তোত্রের মাতৃসাধক যিনি, তিনি তো জানেন রূপ, জয়, ধন, যশ সবই তো ক্ষণস্থায়ী। তাহলে নিত্য পূজায় মাতৃসাধক দেবী মহামায়ার কাছে এই সব ক্ষণস্থায়ী অনিত্যবস্তু চাইলেন কেন? —এটা ঠিক বুঝতে পারি না, বিশ্বাসও করতে পারি না। মুহূর্তেই ভাবলাম এটা আমার ভ্রম। আসলে সাধক চাইছেন— এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, মহাজগৎ মহামায়ার যে রূপে বিধৃত হচ্ছে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ, যে রূপে জগৎ মোহিত, আমাকে সেই সার্বজনীন রূপ, মহত্তম রূপে উদ্ভাসিত করো— মাতৃসাধক এই কামনাই করছেন।

ছয়

আমাদের জীবনটা দড়ি বাঁধা গিঁটের মতো। খুলতে না জানলে জট পাকিয়ে যায়। তখন জীবনে শুধু গিঁটই দেখতে পাই। মা-কে ডাকি— মা এসো, আমার গিঁট খোলো। মা হেসে বলেন, 'তোর কামনা বাসনার গিঁট যে এত বেশি তা খুলবো কেমন করে? বরং তুই তোর জীবনের দড়িতে আমাকে একটা গিঁট দিয়ে বেঁধে নে— দেখবি গিঁট থেকে মুক্তি পাবি। দড়ি রূপী জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখি মাকে গিঁট দিয়ে বাঁধব এমন দড়ির একটুকুও অবশিষ্ট নেই। মাকে আর বাঁধতে পারি না— শেষে ভাবি জীবনের দড়িটা একটু বড় হলেই তো মাকে গিঁট দিয়ে বাঁধতে পারতাম। জীবনের অন্তিম লগ্ন এসে পড়ে, তখন কাতর কণ্ঠে বলি, 'মাগো, তোমার আঁচলে আমাকে গিঁট দিয়ে বেঁধে নাও— কমপক্ষে ধন, রূপ, যশ, জয়ের মোহ হতে মুক্তি পেয়ে তোমার চরণে ঠাঁই করে নিতে পারি— এতেই আমার গিঁট খোলা হবে।

সাত

ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য— নিজের মাকে একদিন বিশ্বের প্রান্তরে প্রান্তরে পৌঁছে দিয়েছিল। যা ছিল একান্ত আপনার তা হলো বিশ্বের সবাকার। সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ লক্ষণ নিজেদের অর্জিত সম্পদকে পৃথিবীর সবার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া। ভারতের ভাস্করেরা, মাতৃসাধকেরা মায়ের রূপকে নিজের সাধনার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ জেনেছিলেন। তাই অনবদ্যরূপের প্রতিমা গড়ে উঠেছিল বিশ্বের মন্দিরে মন্দিরে। বিশ্বজুড়ে পুজো হোত মায়ের। তাই অজস্র নিদর্শন আজও দেখতে পাই। সমগ্র বিশ্বটা তো দেবীর নামেই বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল ভারতবর্ষকে কেন্দ্রীভূত করে। বিন্ধ্যপর্বত হতে পূর্বে যবদ্বীপ পর্যন্ত সকল দেশ বিষ্ণুকান্তা, বিন্ধ্যপর্বত হতে পশ্চিমে পারস্য, মিশর ও রোডেশিয়া প্রভৃতি দেশ অশ্বক্রান্তা, আর বিন্ধ্যাচল হতে নেপাল, মহাচীন প্রভৃতি দেশ রথক্রান্তা নামে বিখ্যাত ছিল।

সকল দেশেই দেবী পূজিতা হতেন। চম্পার মাইথন লিপিতে মহেশ্বরের সঙ্গে উমাকে প্রণাম জানাচ্ছেন দেশবাসী। কম্বোজের পনহিয়া হোবের সর্বত্র দেখা গেছে দেবী দুর্গার মন্দির। যবদ্বীপে দেবী চতুর্ভুজা ময়ূর বাহনারূপে পূজিতা হোন। সুবর্ণদ্বীপে

মা মহিষাসুর দলনীর রূপে পূজিতা হোন। সেমেটিকদের মধ্যে দেবী ননারূপে পূজিতা। ঋকবেদে ননা শব্দের অর্থ 'মা'। মরুতীর্থ হিংলাজকে 'ননই'র তীর্থ বলা হয়। গ্রিস দেশে ওই 'ননা'র নাম 'অনইত্রিস'। আরবদেশে দেবী পূজিতা হতেন 'অল্লভ' নামে। অল্লভ (অল্লা) মাতৃশক্তি। ব্যবিলন ও আসিরিয়ায় দেবী 'ঈশাতা' নামে পূজিতা। আরমেনীয় সাম্রাজ্যে দেবীর নাম ছিল 'অনাহিত'— যিনি অহিত করেন না, 'হিত' (কল্যাণ) করেন। কনানে পূজিতা দেবী অশেরা। ভারতের 'দশেরা'র অপভ্রংশ। জাপানে পূজিতা দেবী 'চনষ্ঠী'। চণ্ডীর অপভ্রংশ। তিব্বত-সহ চীনে দেবী 'মারিচী' নামে পূজিতা। রোমে দেবীর নাম 'অননপরেনা'। ভারতের অন্নপূর্ণার অপভ্রংশ। দেবীর পূজো হতো বসন্তকালে। রোমের vatican city'র Etruscan Museum' রাখা আছে শিব সমতে দেবীর বিভিন্ন মূর্তি। মেক্সিকো ও আমেরিকায় দেবী 'মায়া' রূপে পূজিতা। তাই সেখানকার সভ্যতার নাম মায়া সভ্যতা। সাইবেরিয়াতে চণ্ডী ও শিবের অজস্র মূর্তি পাওয়া গেছে।

যুগে যুগে দেবী পূজিতা হয়েছেন মানুষের দ্বারা। পৃথিবীর সকল সভ্যতার মানুষ দেবী দুর্গাকে তপস্যা করেছেন। তিনি জগতের দুঃখ নাশ করেছেন— জগৎকে পালন করেছেন। তাই তিনি জগৎ পালিনী। ইনিই জগতের অম্বা, জগতের মাতা।

আট

মা মহামায়া জগজ্জননী। তাই আরাধনার উপকরণের মাত্রাও বিশ্বজুড়ে। ষষ্ঠীর অধিবাস থেকে দশমীর অপরাজিতা পূজা পর্যন্ত। কী বিপুল সমাহারে মাতৃসাধক পূজার আয়োজন করেন। সপ্তসমুদ্রের জল থেকে কত সুগন্ধি দ্রব্য। স্নানের উপকরণ, বস্ত্র সম্ভার, অগুরু, চন্দন থেকে ধূপ দীপের কত বাহার। ষোড়শ উপাচারে মাতৃ আবাহনের কতরকম কর বিন্যাস, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ। মুহূর্তে মুহূর্তে কত রকম মুদ্রাভঙ্গি। একশো আটটা পদ্মে সন্ধিপূজা, একশো আট প্রদীপের আলোক বিচ্ছুরণ— কী নেই মায়ের পূজায়! বিশ্বপত্র, যজ্ঞবেদী, সমিধ সংগ্রহ সবই মাতৃপূজার সামগ্রী। নবপত্রিকার প্রবেশ থেকে অপরাজিতা পূজার হরিদ্রাবর্ণের সুতো, কাঁসার পাত্রে নারকেলের জল— মাতৃসাধকের পূজার প্রণালী দেখতে দেখতে জীবনে পঞ্চাশ বছর কেটে গেল। ষষ্ঠী থেকে বিজয়া দশমীর বিসর্জন অবধি মাতৃসাধকের পাশে পাশেই থেকেছি। কখনও মণ্ডপ ছেড়ে যাইনি। যেন মায়ের স্নেহের ঘেরাটোপে আবদ্ধ জীবন। সাধকের কণ্ঠের সুললিত মন্ত্রোচ্চারণে আমার জীবনে এক অপূর্বভাবে সৃষ্টি করত। ইনি পুরোহিত না সাধক? অপরাজিতা পূজার পর হঠাৎ সাধককে বলতে শুনলাম—

''ন জানামি দানং ন চ ধ্যান যোগং।
ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্র মন্ত্রং।।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাস যোগং।
গতিস্ত্বাং গতিস্ত্বাং ত্বমেকা ভবানী।।''

এ কি মন্ত্রধ্বনিত হচ্ছে মাতৃ সাধকের কণ্ঠে— আমি পূজা কাকে বলে জানি না, ধ্যান কাকে বলে জানি না। মাগো আমি শুধু জানি, মা ভবানী তুই আমার গতি—

'গতিস্ত্বাং গতস্ত্বাং ত্বমেকা ভবানি!'

রাজসিক আয়োজনের পর মাতৃসাধকের একেবারে আত্মনিবেদন— তোকে ছাড়া আমি কিছুই জানি না। সাধক ষষ্ঠীর অধিবাসের দিন তো এই আত্ম নিবেদনের পথে গেলেন না? মাতৃপূজার সাধক তো তখন ব্যস্ত পুষ্পচয়নে, উপাচারের ব্যস্ততায় আর মন্ত্রের পরিশুদ্ধতায়। মায়ের পূজার পূর্ণরূপের পরেই ঘটল—নিবেদন। আমার সকল সম্ভার তোমার জন্য উজার করে দিয়েছি মাগো। তাতে আমি তৃপ্ত নই। এবার নিজের জীবন তোমার চরণে নিবেদন করছি— এ তো Total Surrender। এই বিভবময় বিশ্বে মাতৃশক্তির কাছে সন্তানের শেষ সমর্পণ। ধন্য মাগো তুমি— ধন্য তোমার সন্তান সাধক। মহাজগতে সন্তানের সঙ্গে মাতৃপ্রেমের এমন মেলবন্ধন আর কোথায় আছে? কোন আরাধনায় আছে?

নয়

মা মহামায়ার পূজার বাদ্যি বাজলেই জীবনটাকে একবার নতুন করে দেখবার অবসর এনে দেয়। বাল্যকৈশোর যেন হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে পথ কোন সুদূরে— কল্পলোকে, যেখানে শিশিরভেজা দূর্বাঘাস আছে, কাশফুলে বাতাসের শিহরণ আছে, দীঘির মাঝে পদ্মের সৌরভ আছে, আলবাঁধা পথে ধানের সোদা গন্ধ আছে, আকাশ ভরা সূর্যকিরণে রাঙা মেঘ আছে। বহুক্ষণ নৌকায় বসা মাঝির সঙ্গে ধীর প্রবাহিনী নদী আছে, বৃক্ষে বৃক্ষে সহস্র পক্ষীর কূজন আছে। কিন্তু আজ আর তা পাই না। ঠাকুরদা'র সঙ্গে পূজার সামগ্রী জোগাড় করার জন্য প্রকৃতির বুকে সেদিন ছুটে বেড়িয়ে ছিলাম। শীষ ফোটা ধানের ক্ষেতে, হরিদ্রা, কালকচু, মানকচুর ভূমি লগ্নে, জয়ন্তীর শোভনীয় শাখায়, ডালিমের মঞ্জরী বৃক্ষে, বিল্বের পবিত্র পরশে, অশোকের শোকরহিত পুণ্যত্বে, কদলীবৃক্ষের পত্রছায়ায় আমার অন্বেষণ পর্ব চলত। কিশোরের অনুভূতি প্রবণ মনে যেন এই নবপত্রিকাতেই দেবী বোধনের শঙ্খের ধ্বনি বাজত আমার কানে। প্রকৃতির উদাত্ত চেতনায় তার বাণীবদ্ধ মেঠো সুরে আমার কানে চণ্ডীপাঠের মন্ত্র উচ্চারিত হোত। এই ধ্বনির সুরেই কেটে গেছে কবে কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্বের কাল। মা আজও আসেন। আজও যান। হৈ হুল্লোড় আর রোশনী জ্যোৎস্নায় মায়ের চোখটা ঠিক দেখতে পাই না। মায়ের চোখের জলের পরশধারা বোঝার মনটাই হারিয়ে গেছে। ভাসানের পর আজও বাড়ি ফিরি একাকী। যে দুর্গামণ্ডপে ষষ্ঠী থেকে দশমী অবধি মায়ের পুজোতে ব্যস্ত থাকায় কীভাবে সময় কেটে গেছে বুঝতে পারিনি— সেই দুর্গামণ্ডপে একটিমাত্র পিদিম জ্বলে। চারিপাশ অন্ধকার। নির্জন মণ্ডপে ফিস ফিস করে মায়ের গলার আওয়াজ যেন শুনতে পাই। 'বিষণ্ণ হচ্ছিস কেন? —আমার কোলেই তো ফিরে আসবি।'

বার্ধক্যের মাঝে এসে সুদূর দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে থাকি— তখন ধূসর বলে মনে হয় সব— যেন আমার আত্মাকে হারানোর বেদনা অনুভব করি। মায়ের কণ্ঠস্বর শুনে চেতনা ফিরে পাই। যখন ঊর্ধ্বাকাশের দিকে দেখি তখন প্রদীপ্ত সূর্যালোকে উজ্জ্বল ভাস্বরে মনে হয় মানব জগতের কল্যাণ মন্ত্র উচ্চারণ করার জ্যোতিষ্কের দল আমার সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন--- তাঁদের মধ্যে আপনাদেরও দেখতে পাই আমার মায়ের বন্দনা প্রীতির ঘোষক রূপে, জীবন ও অমরত্বের বার্তাবহ রূপে। সেই পবিত্র দৃশ্যকে আমি প্রণাম করি। ▌

বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজো

সপ্তর্ষি ঘোষ

মধ্য কলকাতায় সাবেক পটলডাঙ্গা অঞ্চলের পটুয়াটোলা বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির দুর্গাপুজো দ্বিশতাধিক বছর ধরে সগৌরবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের আদিপুরুষ রামহরি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৮৫ সালে হুগলি জেলার নবগ্রাম থেকে কলকাতায় এসে ৫৪ নম্বর পটুয়াটোলা লেনের বাড়িতে বসতি স্থাপন করেন। এই বাড়িতেই খড়ের চালার চণ্ডীমণ্ডপ নির্মাণ করে ১৭৯১-এ তিনি দুর্গাপুজোর সূচনা করেন অবিচ্ছিন্নতাভাবে যা আজও অব্যাহত। পরবর্তীকালে রামহরির পৌত্র উপমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অদূরে ১।২ নম্বর পটুয়াটোলা লেন-এ তিন খিলানের ঠাকুরদালান তৈরি করে পুজোটি সেখানে স্থানান্তরিত করেন।

প্রতিপদাদি কল্পে বোধন হয় মহালয়ার পরদিন প্রতিপদে। সেদিন থেকেই পুজো, চণ্ডীপাঠ, আরতি শুরু হয়। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় দেবী মূর্তির সামনে ঘট স্থাপন করা হয়। সপ্তমীর দিন বাড়ির দালানেই হয় নবপত্রিকা স্নান। পুজো হয় কালিকাপুরাণ মতে। সপ্তমী, অষ্টমী, সন্ধিপুজো ও নবমীতে পশুবলির প্রথা এখনও বজায় আছে। বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী— তিন দিনই দেবীকে অন্ন, মাছ, পাঁচরকম ভাজা, খিচুড়ি, পোলাও, পায়েস নিবেদন করা হয়। সংকল্প হয় বাড়ির প্রবীণ সদস্যের নামে। পুজোর ব্যয় নির্বাহ হয় পরিবারের সদস্যদের আর্থিক আনুকূল্যে।

সনাতনী ভাবধারায় ডাকের সাজের প্রতিমা। এক চালচিত্রে সপরিবারে মহিষাসুরমর্দিনী সিংহবাহিনী দশভুজা অধিষ্ঠিতা। দেবী দুর্গার বাহন শ্বেতসিংহ। অসুরের গায়ের রঙ সবুজ। আগে ঠাকুরদালানে প্রতিমা গড়া হত। এখন অবশ্য কুমারটুলি থেকে তৈরি করেই নিয়ে আসা হয়। একই মৃৎশিল্পী ৬৫ বছর ধরে প্রতিমা তৈরির দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। আজও দুর্গাপুজোর তিন দিন পুজো দিতে ও প্রতিমা দর্শন করতে পটুয়াটোলা বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে বহু মানুষের সমাগম হয়।

বিপিনবিহারী এবং নিত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (যথাক্রমে পুজোর প্রতিষ্ঠাতার চতুর্থ এবং পঞ্চম অধস্তন পুরুষ)-দের সময়ে পত্র মারফত প্রতিবেশীদের প্রতিমা দর্শন এবং প্রসাদ গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করা হোত। শোনা যায়, দুর্গাপুজোর তিনদিন পল্লীর কোনো বাড়িতে নাকি রান্না হোত না। সবাই এসে ভিড় করতো বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে। এসবই আজ অতীতের স্মৃতিকথা! তবে একশো বছর আগের আমন্ত্রণ পত্র আজও পরিবারে সযত্নে সংরক্ষিত।

বিজয়া দশমীতে কণকাঞ্জলি দিয়ে দেবী দুর্গাকে বিদায় জানানো হয়। পারিবারিক প্রথানুযায়ী বাবুঘাটে প্রতিমা বিসর্জন হয়। ফিরে এসে ঠাকুরদালানে দুর্গানাম লেখা, শান্তিজল গ্রহণ ও বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে দুর্গোৎসব সম্পন্ন হয়।

জাঁকজমকের আধিক্য না থাকলেও পুজোটি নিষ্ঠা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

তথ্যসূত্র :

১। দুর্গাপূজা সেকাল থেকে একাল— বিমল চন্দ্র দত্ত। ২। আনন্দবাজার পত্রিকা— ১০ সেপ্টেম্বর ২০১১। ৩। প্রদীপ ব্যানার্জী।

চিঠিপত্র

পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর অবজ্ঞা

গণতান্ত্রিক রাজনীতি চলে শাসকদল ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমঝোতার মধ্য দিয়ে। এখানে অবজ্ঞা, উপেক্ষা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের স্থান নেই। বিরোধীদের সমালোচনা শাসক-গোষ্ঠীকে সঠিক পথে পরিচালিত করে— নিজেদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে তারা রাজ্য ও দেশচালনার যথার্থ ইঙ্গিত পায়। এখানেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব। দেশে দেশে সুশাসকরা এভাবেই গণতন্ত্রের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেন।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। এখানে আইন সভায় বা অন্য কোনো মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের বক্তব্যের মর্যাদা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না! বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গর্বিত হয়ে বিরোধীদের প্রতিপদে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন। তিনি শুধু একা নন। তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরাও সমানভাবে আইনসভায় এবং অন্যত্র মুখ্যমন্ত্রীকেই অনুসরণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শাসকগোষ্ঠীর এই মনোভাব গভীর চিন্তার বিষয়। প্রতিকার কোন্ পথে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের একটু ভাবা দরকার।

এবারে ২০১৬-র নির্বাচনে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে বিজেপি সব ধরনের মিডিয়া, সভা, মঞ্চের অকারণ বিরোধিতা, বিরূপতা, অপপ্রচার ও কুৎসার বিরুদ্ধে লড়াই করে দেশভক্ত, সচেতন নাগরিকদের ৫৬ লক্ষ ভোট ও তিনটি আসন পেয়েছে। কয়েকটি আসনে অল্প ভোটে পরাজিত হয়েছে। তা না হলে এই আসন সংখ্যা আরও বাড়ত। ওদিকে শাসকদলের ভোটের সংখ্যা নিশ্চিত বিজেপি-কে লজ্জা দিচ্ছে। আসন-২১১; 'ফুসলিয়ে' বর্তমানে-২১৪। আগামীদিনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নৈতিক মান বিচার করে বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে এই সংখ্যা আরও বাড়বে। সম্পূর্ণ অনুকূল পরিস্থিতি শাসকদলের শাসনের। কিন্তু দুঃখের হলেও আমরা দেখছি চিত্র একেবারে বিপরীত।

আমরা যারা সাধারণ নাগরিক এবং অল্পবিস্তর রাজনীতি ও অর্থনীতির চর্চা করি, তাদের মনে হতে পারে শাসকদলের বিজেপি প্রতি গুরুত্ব না দিলেও চলবে। কিন্তু ঘটনা অন্যরকম। শাসক তৃণমূল দলের নেতা, কর্মী, মন্ত্রীদের কথা বাদ দিচ্ছি। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আইনসভা ও অন্যান্য বিভিন্ন মঞ্চে বিজেপি সম্বন্ধে যে-সব বক্তব্য রাখছেন, এক কথায় বলা যেতে পারে 'বিষোদ্‌গার' ও 'মিথ্যাচার'। সব সচেতন নাগরিকের তা জানা। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, বিজেপি একটি 'নিখাদ জাতীয়তাবাদী' দল। এই 'পবিত্র পুণ্যভূমি'— ভারতভূমিতে তার জন্ম। তাই 'সততার গর্বে গর্বিত' কোনো মানুষ তার অগ্রগতি আটকাতে পারবে না। এই বোধোদয় সত্বর হওয়া প্রয়োজন।

—রণজিৎ সিংহ,
কলকাতা-৭০০০৩৬।

হিন্দুদের বিপন্নতার কারণ হিন্দুরাই

ইতিহাস থেকে জানা যায় সিন্ধুনদ তীরবর্তী জনগোষ্ঠীকে বিদেশিরা উচ্চারণগত ত্রুটির কারণে সিন্ধু না বলে হিন্দু বলত। সেই থেকে সর্বপ্রাচীন এই জনগোষ্ঠী হিন্দু নামধারী হয়ে গেল। কোনো স্থানকে কেন্দ্র করে যে জনগোষ্ঠী গড়ে ওঠে সেই জনগোষ্ঠীর নামকরণ হয় সেই স্থানকে কেন্দ্র করে। তাই সিন্ধু নদতীরবর্তী জনগোষ্ঠী পরবর্তীকালে হিন্দু জনগোষ্ঠী নামে পরিচিত হলো। কিন্তু এই হিন্দু জনগোষ্ঠীর বৈদিক ভাবনা এবং তাদের আচার আচরণ ক্রমেই একদিন ছড়িয়ে পড়েছিল সিন্ধু-সরস্বতীর সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূরে। সেই বিস্তৃতি দক্ষিণে ভারত মহাসাগর থেকে হিমালয় পর্বতের উত্তরে চীন-রাশিয়া পর্যন্ত। পূর্বে ইন্দোচীন থেকে পশ্চিম এশিয়ার ইরান পর্যন্ত! হজরতের জন্মের আগে আরবীয়দের পুতুল পূজা বা মূর্তিপূজা তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। একদিন যে শৌর্য বীর্য এবং পরাক্রমে গোটা হিন্দুস্থান সারা বিশ্বকে আন্দোলিত করত আজ তা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়েছে। কেন এই দুর্বলতা, কেন এই ক্ষীণতা?

হিন্দুদের দুর্বলতা প্রকট হয়েছে তাদের চারিত্রিক দোষে। হিন্দুধর্মের বর্ণব্যবস্থার দৌলতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিধানকে বিকৃত করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের আত্ম-অহমিকার বিজয়রথের চাকার নীচে পিষ্ট হওয়া শূদ্রকুল পরিত্রাণ খুঁজতে বহিঃশত্রুকে আপন করেছে কিংবা ধর্মান্তরিত হয়ে তাদেরই জাতিভুক্ত হয়েছে এবং অতীতের অত্যাচারের বদলা নিয়েছে কালাপাহাড় হয়ে। আজ একথা আমাদের কোনোভাবে ভুললে চলবে না যে, সেই ধর্মান্তরিত হিন্দুরাই গর্বিত হিন্দুস্থান বিভাজনের একমাত্র কারণ। এদেশের বিপুলসংখ্যক মুসলমান অথবা খ্রিস্টান আরব কিংবা ইংল্যান্ড আমেরিকা থেকে আসেনি। আমাদের তাই সর্বপ্রথম আত্ম-অহমিকা বা আত্মগরিমা সুলভ দুর্বলতাকে জয় করতে হবে। তার জন্য মহাপ্রভুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দলিত, শোষিত, নিপীড়িত হিন্দুদের বুকে আশ্রয় দেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি। নতুবা ধর্মান্তরকরণ কোনোভাবে আটকানো যাবে না। আর এই ধর্মান্তরকরণ আটকাতে না পারলে বিভাজনের বিষবৃক্ষ একদিন মহীরুহ হয়ে এই ভারতমাতাকে আরও টুকরো টুকরো করে ছাড়বে। গোরক্ষার জন্য সমাজের নিম্নবর্গীয় দলিত এবং আদিবাসী নিধন কোনোভাবেই যেন কাম্য না হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, হিন্দু বিশেষ করে তথাকথিত উচ্চবর্গীয় হিন্দুদের ছদ্মপ্রেম যা বর্তমান রাজনীতিতে, বলা ভাল ভোট রাজনীতিতে খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে--- সেই বিষয়টাও এই বিপন্নতার অন্যতম একটা কারণ। দু'টাকা কেজি চাল কিংবা একশো দিনের একটা কাজ দিয়ে ভোট আদায়ের রণকৌশলে হিন্দুদের ভিখারিতে পরিণত করা হচ্ছে। সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষের কাছে

অনুগ্রহের পাত্র করে তোলা হচ্ছে। আর সুবিধাবাদী ভণ্ড এই শ্রেণী দলিত প্রীতি দেখিয়ে ভোট লুট করছে। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংস্কৃতি থেকে বঞ্চিত করে প্রকারান্তরে তাদের অচেতন অবশ করার হীনপ্রচেষ্টা করে চলেছে সেই হিন্দুরাই। যার ফলশ্রুতিতেই একদিন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, পি আর ঠাকুর কিংবা হেম নস্করের মতো মানুষেরা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী কিংবা বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে সহমত হতে পারেননি। দেশভাগের বিপদ এবং অদূর ভবিষ্যতের বিপন্নতাকে এদের উত্তরসূরিরা এখনও বোঝেন না। আর নেহরু পরিবারের বশংবদরা এবং মার্কসবাদের দীক্ষায় দীক্ষিত কমরেডরা কখনোই বোঝার চেষ্টাই করেন না। আর্য সংস্কৃতিকে তারা কখনো যে খুব শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেছেন তা অতিবড় সমালোচকও স্বীকার করবেন কিনা সন্দেহ। যারা চাণক্যকে চেনে না, কৌটিল্যকে বোঝে না— তারা ভারতবর্ষকে কীভাবে জানবেন।

দীর্ঘ সহস্রাব্দের যে পঙ্কিলতা আমাদের আজ এত অনুদার এবং সংকীর্ণ করেছে— সময় হয়েছে আজ তার অবসানের। সৌভ্রাতৃত্ব এবং ভালবাসাই কাম্য হোক আমাদের সবার জীবনাদর্শে। তাই বলে শৌর্য বীর্য ও বলদীপ্ততা থেকে বঞ্চিত হলে দুর্দশার শেষ থাকবে না আমাদের। আজ বঙ্গের হিন্দুদের যে দৈন্য এবং 'শিয়রে শমন' যে বিপন্নতা হায়নার মতো গ্রাস করতে ছুটে আসছে--- তাদের প্রতিহত করতে জনজাগরণ খুবই প্রয়োজন। নিরপেক্ষতাবাদী পত্রপত্রিকাগুলোর ভণ্ডামি তো কারও অজানা নয়। উত্তরপ্রদেশের ঘটনা, কেরলের গোমাংস বিতর্ক কিংবা গুজরাটে দলিত আক্রমণ—ঘটনাগুলির যেমন মিডিয়া প্রচার হয়ে থাকে পশ্চিমবঙ্গের কালিয়াচক কিংবা উত্তর দিনাজপুরে ঈদের দিনে হিন্দুদের উপর আক্রমণ, বাদুড়িয়ার ঘটনা খবরের কাগজগুলো ফলাও করে ছাপে না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজির রাখার হীন প্রয়াসে সদাসর্বদা সংখ্যালঘু তোষণ করে চলেছে। সুতরাং আজকের যুগে মিডিয়ামুখী হওয়াটাও খুবই প্রয়োজন। প্রয়োজনে তেমন একটি সংবাদপত্র এবং টিভি চ্যানেল বাজারে আনা যায় কিনা সেই প্রচেষ্টা রাখতে হবে।

নেহরু এবং গান্ধীজীর ভুলের প্রায়শ্চিত্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দুদের করতে হবে। এখনো যারা একই রকম ভুল করে চলেছে, তাদের প্রতিহত করতে আত্মসচেতন সংগ্রামী হিন্দুদের খুঁজে আরও সংগঠিত করতে হবে। পরাক্রমের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই কাজ করতে হবে। আমি জানি পশ্চিমবঙ্গের অনেক হিন্দু আছেন যারা হিন্দুত্বের পক্ষে কিন্তু তারা ভয়ে হোক বা ভক্তিতে হোক প্রকাশ্যে আসতে পারেন না। পূর্বতন এবং বর্তমান সরকারের ক্রমাগত মুসলিম তোষণ করাটা হিন্দুদের অনেকেই সহজে মেনে নিতে পারেন না। বৃহত্তর শক্তির কাছে মাথা নত না করে উপায় নেই— তাই চুপ করে থাকেন। এদের সংগঠিত করতে পারলেই সফলতা অনেকটা সহজে ধরা দেবে। এই প্রসঙ্গে বলি, সংযত আত্মপ্রত্যয়ী আচরণ ভাল কিন্তু উন্মাদনা বা হটকারিতা কি ভাল? সেক্ষেত্রে বিরোধীরা অক্সিজেন পেয়ে যায়। তাছাড়া দলিত বনবাসী এবং বর্তমান সুন্নী মুসলমানরা--- তারা তো আমাদেরই পূর্বপুরুষের বংশধর। তাই অমানবিকতা চারিত্রিক দৃঢ়তার কারণ হতে পারে না। বরং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং সেই যুদ্ধে জয়লাভই হোক আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

—**বারিদবরণ বিশ্বাস,**
বড়জোড়া, বাঁকুড়া।

মক্কা-মদিনায় গোহত্যা নিষিদ্ধ

প্রসঙ্গ 'মক্কা ও মদিনায় গোহত্যা নিষিদ্ধ?' (স্বস্তিকা : ২৭.৬.১৬)। প্রতিবাদী পত্রটিতে বিমলেন্দু ঘোষ কোরানের সুরা : মায়েদাহ, আয়াত নং-১ উদ্ধৃতি দিয়ে কোরানে গোহত্যার স্বীকৃতির কথা জানিয়েছেন। (...যেসব জন্তুর কথা বলা হচ্ছে তা ছাড়া 'আনআম' তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো)। এই বৈধকরণের মাধ্যমে আল্লার উদ্দেশে পশু কোরবানি বিধিকে নির্দিষ্ট করা হচ্ছে। ইসলামি শাস্ত্রে গোহত্যার সুনির্দিষ্ট অনুমতির প্রমাণ নিয়ে পক্ষে ও বিপক্ষে দীর্ঘদিনের তর্ক আছে। উল্লিখিত পত্রে সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েও আলোচনা সূত্রে বলা যায় যে কোরানে লিখিত 'বৈধ' করণের ঘটনায় প্রমাণ যে হজরত মহম্মদের পূর্বে আনআমে উল্লিখিত প্রাণীসমূহ বিশেষ করে গোবধ অবৈধ ছিল। কোরবানি বৈধ করা প্রাণীর সংখ্যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে হয়তো প্রাণীহত্যাই নিষিদ্ধ ছিল। অন্তত কোরবানি ঐতিহাসিক সাক্ষ্য অনুযায়ী প্রশ্নে। এই অনুমান সম্পূর্ণ নস্যাৎ করা যাবে না। তার কারণ হল, শেষ নবি হজরত মহম্মদের পূর্বে অর্থাৎ প্রাক-ইসলাম যুগে কয়েক হাজার বছর ধরে অন্য এক ধর্মচিন্তা ও তজ্জাত সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল যাতে বিশেষ করে গোহত্যা অবৈধ ছিল। কারণ গোরু অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা অধিকতর পবিত্র ও প্রয়োজনের নিরিখে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল। এর প্রমাণ হজরত নবির এই বাণী : 'আগরমূল বকরা ইনকা সাইদতুল বাহায়ান'। (গোরু চতুষ্পদ প্রাণীর রানি, তাকে শ্রদ্ধা করবে।) পূর্ব প্রচলিত সংস্কারের প্রভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। যার প্রমাণ হজরত আলির আরেকটি বাণী : 'লাহামূল বকরা-দাউন বাল-বামুহা দাউন ওয়া সামানোহা শিফায়ুন' যার অর্থ, গোমাংস রোগ-সদৃশ, গোরুর দুধ ঔষধতুল্য, আর গাভী স্বয়ং আরোগ্যরূপিণী।

প্রচলিত ধর্মধারণার সংস্কার কার্যে ব্রতী হয়ে হজরত নবি গোহত্যাকে বৈধতা দান করেন বলে মনে হয়। মহাপুরুষদের মধ্যে মতদ্বৈধ ধর্মীয় জগতে বিরল নয়। আবার, ওই সময় মরুপ্রধান মধ্যপ্রাচ্যে নিরামিষ খাদ্যের অভাব হেতু আমিষ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার প্রত্যাহারও কারণ বলে অনুমান করা যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে হিন্দুধর্মে স্মরণাতীতকাল হতে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত, গাভীঃ- ''গোমাতা সর্বভূতানাং গাবঃ সর্বসুখপ্রদাঃ।'' পাঁচ হাজার বছর আগে সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম পোষ্য ছিল গাভী। জাগতিক জীবনে গোরুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা চিরদিনই শ্রদ্ধার স্বীকৃত।

—**অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়,**
তারকেশ্বর, হুগলী।

যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা

স্বামী সুনিশ্চিতানন্দ

"কেবা কালী কেবা প্রভু না পারি বুঝিতে
কালীতে কেবল তিনি মা কালী তাঁহাতে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি প্রণেতা শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী ভক্তপ্রবর অক্ষয় কুমার সেন মহাশয় যথার্থই অনুভব করেছেন। শ্রীশ্রী চণ্ডী গ্রন্থে দেবীস্তুতিতে দেখা যায়, 'যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ-নমস্তস্যৈ-নমস্তস্যৈ নমো নমঃ'।।

অর্থাৎ কিনা যে দেবী সাধারণ দেবী নন, মহাদেবী, সর্বভূতে ভ্রমরূপে অর্থাৎ অজ্ঞানরূপে সর্বজীবের মধ্যে অবস্থান করেন তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার বলে পূজা-অর্চনা করে থাকেন। কারণ জীব মাত্রেই ভ্রমে পতিত। কী সৎ কী অসৎ বিচার করা কঠিন হয়ে ওঠে। ভক্তের শরণাগতি ছাড়া উপায় নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলেছেন, 'কোন নুড়িতে নারায়ণ আছে কে বলতে পারে'! সব নুড়িতেই নারায়ণ দর্শনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। 'ভ্রান্তি' মানে 'অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ' অর্থাৎ যা নয়, তাকে তা মনে করা রূপ মিথ্যাজ্ঞান। শাস্ত্রে সেই কথাই উল্লেখ আছে। প্রতিদিন ভক্ত পূজা-অর্চনা করেন— সংসার যন্ত্রণায় পীড়িত হয়ে ভক্তিনত দেহে স্মরণ করলে তিনি বিপদ নাশ করেন। সেই মঙ্গলময়ী পরমেশ্বরী ভ্রান্তিরূপী দেবী এই বিশ্বাস।

তিনি ইচ্ছাময়ী, তাঁর ইচ্ছাতেই এই জগৎ সৃষ্টি স্থিতি সংহারের লীলা আবহমান কালের গতিতে প্রবহমান। জনক নন্দিনী মা সীতাদেবী স্নেহের দুলাল লব কুশকে বলেছেন— "ওরে কুশীলব করিস কী? গৌরব ধরা না দিলে পারিস কি ধরিতে।" পবনপুত্র মহাবীর হনুমানকে রশিতে বেঁধে মা সীতাদেবীর সম্মুখে যখন উপস্থিত করেন রামায়ণে তা দেখতে পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের একটি ঘটনা— ১৮ অক্টোবর ১৮৮৪। শারদীয়া দুর্গপূজার বিজয়ার দিনে সুরেন্দ্রনাথ সকালবেলা শ্যামপুকুরের বাড়িতে ঠাকুরকে দেখতে এসেছেন। এবৎসর তাঁর বাড়িতে পূজায় ঠাকুর যেতে পারেননি। সুরেন্দ্রর ভারী দুঃখ। আজ মায়ের বিসর্জনে সুরেন্দ্র ভাববিহ্বল হয়ে কত কথা বলছেন। ঠাকুর জানালেন যে, কাল সন্ধ্যা সাতটা-সাড়ে সাতটার সময় ভাবে দেখলাম তোমাদের দালান। শ্রী দুর্গাপ্রতিমা রহিয়াছেন দেখলাম সব জ্যোতির্ময়। এখানে ওখানে এক হয়ে আছে। যেন একটা আলোর স্রোত দু'জায়গার মাঝে বইছে, — এ বাড়ি আর তোমাদের সে বাড়ি।

সুরেন্দ্র : আমি তখন ঠাকুরদালানে মা, মা বলে ডাকছি,— দাদারা ত্যাগ করে উপরে চলে গেছে। মনে উঠলো— মা বললেন 'আমি আবার আসব।' শ্রী ঠাকুরের নাম অলৌকিকতার কাহিনির মধ্যে খুঁজে পেতে পারি। ভ্রান্তির এক অনন্য রূপ যা মানবমনকে উচ্চ ভাবরাজ্যে উপনীত করতে পারে। হয়তো বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সম্ভব না হতে পারে। কারণ শুধু চর্মচক্ষুর মধ্যেই বিজ্ঞান বর্তমান। অধ্যাত্মজগতের ব্যাখ্যায় বলা হয়ে থাকে যেখানে বিজ্ঞানের শেষ, সেখান থেকেই শুধু অধ্যাত্মবাদের জন্ম বা উদয়।

একবার কাশী সেবাশ্রমের ব— মহারাজকে দীক্ষা দিবার জন্য আমি (স্বামী গিরিজানন্দ) শ্রীমা সারদাদেবীকে অনুরোধ করি। শ্রীমা বলেন, 'কাশীতে আমি কাউকে দীক্ষা দেব না।' তুমি একটা ঠাকুরের নাম লিখে দাও।' আমি বলিলাম, 'বেশ কথা। আমি নিজেই একে কিছু বুঝি না, তার ওপর অপরকে বোঝাতে যাব?' শ্রীমা হাসিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা অন্য জায়গায় দেব, এখানে না।' আমি কাশীতে দীক্ষা না দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। শ্রীমা বলেন, 'কাশীতে যা করা যায়, তা অক্ষয় হয়। দীক্ষা দিয়ে আমি শিষ্যের পাপ গ্রহণ করি। পাপকে অক্ষয় করে নেব কেন?' মার কৃপাকটাক্ষে এ জগৎ সৃষ্টি, সাধক কমলাকান্ত চক্রবর্তীর সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে—

"কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা সুধা তরঙ্গিণী।
তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দাও মা জননী।।
লম্ফে ঝম্ফে ধরা, অসি ধরা করালিনী।
তুমি ত্রিগুণা ত্রিরূপা তারা ভয়ঙ্করা কালকামিনী।।
সাধকের বাঞ্ছা পূর্ণ কর নানা রূপ ধারিণী।
কভু কমলের কমলে নাও মা পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী।।

শ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য শ্রী নিশিকান্ত মজুমদার তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন— একদিন জয়রামবাটিতে মা তাহার রাঙা পা দু'খানি ঝুলাইয়া তক্তাপোশের ওপর বসিয়া আছেন। আমি তাহার চরণপ্রান্তে বসিয়া আবদার করিলাম, 'মা, আমার বড় সাধ তোমার রাঙা পা-দুখানি আমার হৃদয়ে তুলে ধরি'— এই কথা বলিয়া মেঝেতে শুইয়া পড়ি। মা হাসিতে হাসিতে ছেলের মত সাধ বলিয়া রাঙা পা-দুখানি আমার হৃদয়ে রাখিলেন...।' (মাতৃদর্শন পৃ. ২৪৭)

শ্যামাপূজায় শ্যামপুকুরে শ্রীশ্রী ঠাকুরের অবস্থানকালে জানা যায় শ্রীশ্রী ঠাকুরের মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময়— দু'হাতে বরাভয় মুদ্রা এবং দেহ নিষ্পন্দ বাহ্যশূন্য। একটি অদ্ভুত রূপান্তর। শ্রীম অর্থাৎ মাস্টারমহাশয় তাদের চোখে তখন কীরূপ ঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন। ২০ মার্চ ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ শ্রীমকে প্রশ্ন করেছিলেন— 'কালীপূজার দিন শ্যামপুকুরের বাড়িতে ঠাকুর কাকে সব নিবেদন করলেন'? উত্তরে শ্রীম বলেন : 'শ্রীঠাকুর নিজেকেই নিজে নিবেদন করলেন। সকলে সেই ফুল দিয়ে ঠাকুরকে পূজা করলেন। অমনি তিনি বরাভয় মুদ্রা ধারণ করলেন। দুই হাতে বর আর অভয় এই মুদ্রা (দুই হাতে দেখাইয়া) এমন করে। তখন সকলের বুঝতে বাকি রইল না তিনি কে।' (শ্রীম দর্শন-৬ পৃ. ১০৫, শ্রীম'র জীবন দর্শন-পৃ. ২৩৭)।

এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিকথা উল্লেখ করেছেন : ''শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে বসিয়া আছি কয়েকটি ভক্তও সেখানে উপবিষ্ট। পরমহংস হঠাৎ এক সময়ে কক্ষ হইতে বাহিরে গিয়াছেন। ভক্তেরা নিজেদের মধ্যেই ঈশ্বরের গুণাগুণের বিচার আরম্ভ করিলেন। তিনি কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে কহিলেন— ''চুপ কর তো তোরা, ঈশ্বরের গুণাগুণের কথা এভাবে বিচার করে কী লাভ বল দেখি। তার মহিমা বুঝতে হলে স্মরণ মনন ধ্যান ধারণা দিয়ে তা করতে হয়। তর্ক করে কী তা বুঝা যায়? ঈশ্বর যে করুণাময় একথা কি যুক্তি দিয়ে সত্যিই আমায় বোঝাতে পারিস? এই যে সেদিন সাবাজপুরে বন্যা আর ঝড়ে শত শত লোকের প্রাণ নষ্ট হলো, একি ঈশ্বরের করুণার নিদর্শন? তোরা হয়তো বলবি এই ধ্বংসের ফলে ভবিষ্যতের নতুন সৃষ্টির পথ পরিষ্কার হলো। কিন্তু আমি তর্ক করে বলব— যিনি সর্বশক্তিমান একদিকে সৃষ্টি করতে হলে কি তাকে আবার একদিকে ধ্বংস করতে হবে? শত শত অসহায় শিশু-নারী-বালক-বৃদ্ধের কান্নার মধ্যে দাঁড়িয়ে কি ঈশ্বরের করুণার কথা কল্পনা করা যায় রে'? একজন ভক্ত-শ্রোতা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল— 'তবে কি বলতে হবে ঈশ্বর নিষ্ঠুর?' শ্রীরামকৃষ্ণ দৃঢ় কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন— 'আরে বোকা কে তোকে তা বলতে বলছে? ঈশ্বরের গুণাগুণ নির্ণয় কে করবে? তার অনন্ত মহিমার অন্ত কে করবে। তাই তো বলছি, কাতর হয়ে যুক্ত করে শুধুই প্রার্থনা কর— ঈশ্বর তোমার মহিমা বুঝবার মতো ক্ষমতা আমাদের নেই। তুমি কৃপা করে আমাদের জ্ঞাননেত্র খুলে দাও।'' (শ্রীরামকৃষ্ণকে যে রূপে দেখিয়াছি, পৃ. ৩৬০)

তিনিই পরমা প্রকৃতি, অনন্তরূপিণী, তিনিই ভ্রান্তিরূপিণী, তিনিই তুষ্টিরূপিণী, তিনিই লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, স্মৃতি ,দয়া। তিনিই আবার 'সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা' রূপে অধিষ্ঠিতা হয়ে শরণাগতের রক্ষা করেন, পূজা গ্রহণ করেন। তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আবহমান কালের গতিতে একই সমস্যায় জর্জরিত মানুষ পিতৃস্নেহ, মাতৃস্নেহ, পতিপ্রেম, স্বজনপ্রীতি, বন্ধুপ্রীতির আকর্ষণে মমতাযুক্ত হয়ে তাদেরই দুর্ব্যবহারে সর্বস্বান্ত হয় স্বার্থ দ্বন্দ্বের মোহজালে। তবু তাদের আমরা ভুলতে পারি না, বিতাড়িত অপমানিত হয়ে এমনি পরিস্থিতিতে আমাদের জীবন কাটাতে হয়। মেনে নিতে হয়, অসহায় হয়ে শুধু দেখে যেতে হয়। তবু আমরা নিষ্ঠুর হতে পারি না। প্রিয়জনের প্রতি শ্রীচণ্ডীতে যেমন রূপে আমরা দেখেছি ও দেখতে পাই একজন রাজার জীবনে, একজন ব্যবসায়ী জীবনে। রাজা সুরথকে বিতাড়িত হতে হয়েছে দুষ্ট বলবান এবং দুরাত্মা মন্ত্রীগণের চক্রান্তে। রাজসিংহাসন ও রাজপরিবারের সর্ববিধ সুখভোগ বিসর্জন দিয়ে প্রাণটুকু রক্ষার জন্য গভীর অরণ্যে আশ্রিত হতে হয়েছে। অপর এক ব্যবসায়ী (বৈশ্য) সমাধি ধনসম্পত্তি ও স্ত্রী-পুত্রাদির দ্বারা পরিত্যক্ত। বিশ্বস্ত আত্মীয় স্বজন সেই সুযোগে সমস্ত কিছু আত্মসাৎ করেছে। কোনো প্রকারে প্রাণ নিয়ে গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে অতি কষ্টে দিনযাপন করছে। তবু ভুলতে পারছে না স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এবং আত্মীয়-বন্ধুদের কথা। তারা কুশলে আছে কিনা ভেবে ব্যাকুল ভারাক্রান্ত রাজা সুরথ চিন্তাগ্রস্ত, তার অবর্তমানে রাজ্যের কী অবস্থা, রাজপরিবার, নগর সুরক্ষিত কিনা? নগর ধর্মানুসারে রক্ষা হচ্ছে কিনা, তাঁর প্রিয় হস্তী কেমন আছে ভেবে তিনি ব্যাকুল, মোহগ্রস্ত। সেই গভীর জঙ্গলে দুজনের পরিচয়। দুজনকেই তার প্রিয় স্বজনেরা পরিত্যাগ করেছে। তবুও তাদের প্রতি অতিশয় আসক্তি ও অত্যন্ত দুঃখিত, মমতাজনিত আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে পারছেন না। দুজনেই বুদ্ধিমান। তথাপি আমাদের মনে যে মোহ উৎপন্ন হয়েছে— এটা কেন? এই প্রশ্ন নিয়েই ঋষি মেধসমুনির আশ্রমে এসে জানতে পেরেছিলেন, হীন মানুষের মতো এরকম মূঢ়তার কারণ ভগবতী মহামায়ার প্রভাবে সকল জীবকুল মমতারূপে আবর্তযুক্ত মোহরূপ গর্তে পড়ে আছে। সেই দেবী মহামায়া জ্ঞানীদের চিত্তকে বলপূর্বক আকর্ষণ করে মোহাবৃত করেন, আবার তিনি প্রসন্না হলে মানুষকে মুক্তিদানের জন্য বরদান করেন, কারণ তিনি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী। শরণাগতিই একমাত্র মুক্তির পথ জেনে মেধসমুনির আজ্ঞায় দেবী মহামায়ার আরাধানায় রত হয়ে দেবীর অভিষ্ট কৃপালাভ করেন রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি।

সাধক রামপ্রসাদের জীবনে আমরা দেখতে পাই কত প্রকার ছলনার মধ্যে বিভ্রান্তিকর লীলা। বেড়া বাঁধার সময় কন্যার রূপ ধরে ছলনা করা, কিংবা রামকৃষ্ণ অবতারে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ভ্রাতুষ্পুত্র শিবুর সঙ্গে জয়রামবাটি থেকে কামারপুকুর ফেরার পথে ফাঁকা মাঠে নিজে কালী স্বরূপা স্বীকার করে শিবুর কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেতে হয়। কিংবা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের পাদচারণের সময় জমিদার মথুরবাবু ঠাকুরের মধ্যে কিছুক্ষণ মা ভবতারিণী ও শিবদর্শন লাভ করে বিভ্রান্তিতে পতিত হন। মথুরবাবুর আকুল প্রার্থনা শ্রী ঠাকুর স্বীকার করেন জানা যায়।

স্বামী প্রেমানন্দের একটি পত্র থেকে জানা যায় : ''শ্রীশ্রী মাকে কে বুঝছে? কে বুঝতে পারবে? তোমরা সীতা, সাবিত্রী, বিষ্ণুপ্রিয়াজী, শ্রীমতী রাধারানী এদের কথা শুনছ। মা যে এদের চেয়েও উঁচুতে উঠে বসে আছেন। ঐশ্বর্যের লেশ নেই...।'' মা'র বিদ্যার ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত, একি মহাশক্তি। জয় মা!! জয় মা!!! জয় শক্তিময়ী মা!!! (স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী (উদ্বোধন)। স্বামী বিবেকানন্দ কবিতায় লিখেছেন : 'দাস তোমার দোঁহস্কার, সশক্তিক নমি তব পদে।'

মাতৃশক্তি যে নামে রূপে শরণাগতের কাছে যে রূপে লীলা করে থাকুন না কেন, সমগ্র মানবজাতিকে সত্যের পথে এবং নতুন ভাবে আগামী দিনের পথে নিয়ে চলেছেন— ভক্ত মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন।

দুর্গতিনাশিনী দুর্গা বিশ্বমাতা মহেশ্বরী।
সংনম্যতে সদা দেব প্রসীদ জগদম্বিকে।।

(লেখক নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী)

চণ্ডীপাঠ-সম্প্রচারের আদিগুরু বীরেন্দ্রকৃষ্ণ

রূপশ্রী দত্ত

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ভারতীয় সম্প্রচার-চর্চার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি সংস্কৃতির এই শাখায় চিত্রনাট্যকার, অভিনেতা, আবৃত্তিকার ও পরিচালক— বহুমুখী গুণের আধার ছিলেন। তাঁর জন্ম ৪ আগস্ট, ১৯০৫ মৃত্যু ৩ নভেম্বর, ১৯৯১। তাঁর শিক্ষায়তন ছিল স্কটিশ চার্চ কলেজ। মাতা সরলাবালা দেবী ও পিতা কালীকৃষ্ণ ভদ্র।

১৯৩১ সালে আকাশবাণী-প্রচারিত মহালয়ার ভোরে উদাত্তকণ্ঠে চণ্ডীপাঠ তাঁকে চিরকাল দেশবাসীর মনে স্মরণীয় করে রাখবে। পিতৃপক্ষের শেষ ও দেবীপক্ষের প্রারম্ভের পুণ্যলগ্ন মহালয়ার সঙ্গে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ একাত্ম হয়ে আছেন। গান ও অভিনয়ে তিনি বরাবরই অনুরাগী ছিলেন। শৈশবে তাঁর একবার মারাত্মক ডিপ্‌থিরিয়া হয়েছিল। তখনকার ইউরোপীয়ান ডাক্তার বলেছিলেন, ব্যাধি হয়তো সারবে কিন্তু চিরকালের মতো স্বরভঙ্গ হবে। অদ্ভুতভাবে তাঁর এই ঈষৎ অন্যরকম বিচিত্র কণ্ঠই যেন তাঁকে কণ্ঠশিল্প চর্চায় অনন্য সাফল্য ও জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছিল। স্কটিশ চার্চ থেকে বি.এ পাশ করে কিছুদিন আইন অধ্যয়ন করেছিলেন। এরপর আকাশবাণী কলকাতায় সম্প্রচারের সঙ্গে যুক্ত হলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম রমা। আকাশবাণীর প্রতিটি বিভাগেই লোকাভাব ঘটলে তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে সেগুলি সামলে নিতেন। যেমন 'প্রশ্নোত্তর' 'নারীজগৎ' 'নাটক' কিংবা 'নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে'।

১৯২৯ সালে প্রথম রেডিও পত্রিকা 'বেতার জগৎ'-এর মূল সহযোগী উদ্যোক্তা ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। সম্পাদক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারকে তিনি এ বিষয়ে সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করতেন। 'বিষ্ণুশর্মা' নামে এক সময় তিনি 'মহিলামহলও পরিচালনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রবল জনস্রোতের জন্য জোড়াসাঁকো থেকে আকাশবাণীর ধারাভাষ্য সম্প্রচার করা যায়নি। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ নানারকম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নিমতলা শ্মশানঘাট থেকে ধারাভাষ্য দিয়েছিলেন। বলেছিলেন— 'ভাগীরথীর পশ্চিমে সোনার সূর্য অস্তগামী। গেরুয়া রঙের নদীতে বেদনার ছায়া। এ যেন আমাদের প্রিয় রবি-কবিরই প্রতীক।'

জনপ্রিয় অভিনেতা বিকাশ রায় এক সময় রেডিও-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর সম্প্রচার-শিল্পের গুরু হিসেবে বীরেন্দ্রকৃষ্ণকে মনে করতেন।

মহালয়ার পুণ্যলগ্নের ব্রাহ্মমুহূর্তে পবিত্রতার প্রতীক বীরেন্দ্রকৃষ্ণকে যেমন লোকে চিরকাল মনে রাখবে তেমনি মনে রাখবে তাঁর ছদ্মনাম 'বিরূপাক্ষ' জবানীতে লেখা 'ঝঞ্ঝাট' বইটি। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার বিষয়গুলিকে উইট, হিউমার ও স্যাটায়ারের মোড়কে মুড়ে তিনি যত্নসহকারে পাঠকদের পরিবেশন করেছেন। ■

উৎসব

দুর্গাপূজা

দেবী দুর্গা মহাশক্তির প্রতীক। শক্তি লাভের জন্য মানুষ তাঁর আরাধনা করে থাকে। স্বর্গলোকে বারবার অসুরদের আক্রমণ হয়। একবার মহিষাসুর নামে এক অসুর স্বর্গ আক্রমণ করলো। এই মহিষাসুর ভীষণ শক্তিশালী। দেবতাগণ যুদ্ধ করে কিছুতেই তাকে হারাতে পারছিল না। তখন সবাই মিলে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন, আপনি কিছু উপায় বের করুন, নইলে স্বর্গলোক ধ্বংস হয়ে যাবে। ব্রহ্মা তখন মহামায়া আদ্যাশক্তিকে আহ্বান করতে বললেন। এই শুনে দেবতারা একমনে সেই মহাশক্তির আহ্বান করলেন। তখন দশহাত নিয়ে দেবী দুর্গা আবির্ভূতা হলেন। দুর্গা ছাড়া তাঁর আরোও অনেক রূপ ও নাম আছে। যেমন— চণ্ডী, কালিকা, ছিন্নমস্তা, কাত্যায়নী, শাকম্ভরী প্রভৃতি। দেবীদুর্গার সঙ্গে মহিষাসুরের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। অবশেষে মহিষাসুরকে বধ করে তিনি স্বর্গে শান্তি ফিরিয়ে আনেন।

অসুরকে বধ করার জন্য দেবী যখন আবির্ভূত হন তখন দেবতারা তাঁর হাতে নানা অস্ত্র তুলে দেন। নারায়ণ দেন চক্র, বরুণ দেন শঙ্খ, ত্রিশূল দেন মহাদেব, যমরাজ দেন গদা, ইন্দ্র দেন বজ্র, এছাড়াও অন্য দেবতারা দেন ধনু, খড়্গ, পাশ ইত্যাদি নানা অস্ত্র। দেবীদুর্গা দশ হাতে দশ অস্ত্র নিয়ে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

মাতৃরূপেণ

মাতৃরূপের প্রতিমূর্তি দেবী দুর্গা। স্বামী সন্তান নিয়ে তাঁর ভরা সংসার। শরৎকালে দেবী তাঁর সন্তানদেরকে নিয়ে পিতৃগৃহে আসেন। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ সবাইকে নিয়ে। পতি মহাদেবকে কিন্তু রেখে আসেন কৈলাসে। মর্ত্যে দেবী দুর্গার সঙ্গে সঙ্গে এই চার জনও পূজা পান। দেবী লক্ষ্মী হলেন ঐশ্বর্যের দেবী। তাঁর বাহন পেঁচা। সরস্বতী বিদ্যার দেবী। তিনি বীণা হাতে থাকেন। সরস্বতীর বাহন রাজহংস। কার্তিক দেবসেনাপতি। তাঁর বাহন হলো ময়ূর। আর গণেশ সিদ্ধিদাতা। ইঁদুর তাঁর বাহন। পিতৃগৃহে দেবী তিনদিন থাকেন, তারপর আবার ফিরে যান। পুজোর চারদিন আমরা মায়ের আরাধনা করে আনন্দে মেতে থাকি।

রনি চট্টরাজ

রাজ্য পরিচিতি

নাগাভূমি

উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড়ি রাজ্য ন্যাগাল্যান্ড বা নাগাভূমি। পূর্বদিকে মায়ানমার সীমান্ত। ১৯৬৩ সালের ৩০ নভেম্বর এই রাজ্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে। আয়তন ১৬ হাজার ৫৭৯ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ১৯ লক্ষ ৮০ হাজার ৬০২ জন। রাজধানী কোহিমা। ভাষা নাগামিজ, ইংরেজি ও হিন্দি। এটি ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্য। এই রাজ্য প্রধানত ১৬টি জনজাতি অধ্যুষিত— আও, আংগামি, চাং, কোনিয়াক, লোথা, সুমি, চাকেশাং, খিয়াননিউনগাল, ডিমাসা, কাচারি, ফোম, রেংমা, সংতাম্, ইমচুঙ্গার, কুকি, সেমি-লিয়াংমাই। এছাড়া পোচুরি নামে উপ-উপজাতিও বেশ কিছু সংখ্যায় রয়েছে। কৃষি এখানকার প্রধান জীবিকা। ধান, বার্লি, মিলেট, তামাক, ডাল ও তৈলবীজ প্রধান শস্য। প্রধাননদী ধনসিরি, দোয়াঙ্গ ও ঝাংঝি।

এসো সংস্কৃত শিখি

अङ्गीकृतं खलु ?

রাজি কি না?

कति अपेक्षितानि ?

কত চাই?

अद्य एव किम् ।

আজকেই কি?

इदानीम् एव किम् ?

এখনই কি?

आगन्तव्यं भोः ।

আসতেই হবে।

ভালো কথা

জওয়ানদের শ্রদ্ধা

আমাদের এখানে কাশ্মীরে জঙ্গিহানায় শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হলো। দেশ রক্ষা করতে বহু জওয়ান মৃত্যুবরণ করে। কিছুদিন আগে কাশ্মীরে ১৮ জন জওয়ান জঙ্গিহানায় প্রাণ হারিয়েছে। আমাদের এখানে শহীদ জওয়ানদের ছবিতে মালা পরিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হলো। এক মিনিট মৌন থেকে শ্রদ্ধা জানানো হলো। যারা শহিদ হয়েছে তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়। এতে অনেক মানুষ অংশ নিয়েছে।

নবার্ক রায়, কলকাতা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

রামু পাগলা

তিমির মুখার্জী, নবম শ্রেণী

তিলপাড়ার ওই রামু পাগলা
পাগলামি তার 'সাজা'
নানানরকম পোশাক পরে
পায় সে কেবল মজা।
সকালবেলায় সাহেব সাজে
বিবি বিকেলবেলা

সন্ধ্যে হলেই ভূতের সাজে
ভয় দেখানো খেলা।
কোনোদিন সে মেয়ে সেজে
করে কত কাণ্ড
বলে, মেয়েরা যদি ছেলে সাজে
ছেলেরা মেয়ে সাজলেই মন্দ?

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

মেল করা যেতে পারে।

পরিবেশ ও প্রকৃতি রক্ষায় মেয়েরা

সুতপা বসাক ভড়

আজ পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে মারাত্মক জীব হলো মানুষ। অসীম তার চাহিদা। প্রতিদিন বেড়ে চলা মানুষের এই প্রয়োজনই বস্তুত সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিশেষত উচ্চ এবং মধ্যম আয়ের মানুষ, সরকার এবং বড় বড় সংস্থাগুলি এর জন্য সব থেকে বেশি দায়ী। নিজেদের জীবনশৈলী সম্বন্ধেও যদি ভাবি, তাহলে দেখতে পাব আমরা প্রকৃতির হানিকারক জিনিসগুলি কীভাবে ব্যবহার করে চলেছি। এইভাবে প্রকৃতি এবং পরিবেশকে দূষিত করার জন্য আমরা নিজেরাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে দায়ী। বাচ্চাদের বই-খাতা যা বেশীরভাগই প্লাস্টিকের মলাট দেওয়া, গাড়ি, এ.সি.-র ক্রমবর্ধমান সংখ্যা, রিয়েল এস্টেটের রমরমা ব্যবসা প্রমাণ করছে যে কীভাবে আমরা এগুলির বেহিসাবি ব্যবহার করে চলেছি। প্লাস্টিক তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না, দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থেকে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। গাড়ি এবং এয়ার কন্ডিশনার তৈরির সময়, ব্যবহারের সময়, এমনকী ফেলে দিলেও তা প্রকৃতির ওপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে। বাড়ি তৈরির সময় সিমেন্টের পরতের জন্য ভূমির জলশোষণ করার ক্ষমতা নষ্ট হয়। ফলস্বরূপ, মাটির জৈববিবিধতাও ব্যাহত হয়।

কয়লা থেকে পাওয়া শক্তি প্রকৃতির ভারসাম্য এবং বন-জঙ্গল নষ্ট করে দেয়। খনি থেকে কয়লা বের করার জন্য মাটি-জঙ্গল-প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। এরপর ওই শক্তির ব্যবহার বায়ুদূষণের অন্যতম প্রধান কারণ সাব্যস্ত হয়েছে। জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি যে কত গ্রাম-বন-জঙ্গল ধ্বংসের ফলে তৈরি হয়, তার সঠিক হিসাব দেওয়া মুশকিল। এর ওপর নদীর দূষণ, নদী-অববাহিকার ক্ষতিসাধন ও জল-বিদ্যুতের বেহিসাবি ব্যবহার করে চলেছি। একথা সত্যি যে আমাদের ঊর্জা, বাড়ি এবং যাতায়াতের সাধন চাই। এখন প্রশ্ন উঠছে যে, এই উপকরণগুলি সব থেকে বেশি ব্যবহার কারা করছে? একটি সমীক্ষার মতে ধনী উপভোক্তা গরিব উপভোক্তার থেকে ৪.৫ গুণ বেশি কার্বন-ডাই- অক্সাইড পরিবেশে উৎপাদন করে এবং প্রায় তিনগুণ বেশি সম্পদ উপভোগ করে থাকে। একটু ভাবুন তো, আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে?

এ ব্যাপারে আমরা মহিলারা পরিবেশ এবং প্রকৃতিকে রক্ষার জন্য দায়বদ্ধ। একটু সতর্ক হলেই আমরা আমাদের উপভোগের সীমা কম করতে পারি। এজন্য সর্বপ্রথম আমাদের নিজেদের জীবনশৈলীর প্রতি ভালভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। তারপর ওইসব জিনিস আমরা চিহ্নিত করব, যেগুলি না হলে বা খুব সামান্য পরিমাণে হলেও আমাদের বিশেষ কোনো অসুবিধা হবে না।

দৈনিক ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে আমরা বাজার করার সময় প্লাস্টিকের ব্যাগ দোকানদারের থেকে না নিতে পারি। জিনিসপত্র কেনার সময় একটি বড় ব্যাগ সঙ্গে নিলে ওই ছোট প্লাস্টিকের ব্যবহার অনেক কমে যায়। প্লাস্টিকের জিনিসে বাজার ভরে গেছে— নিছক ভাল লাগছে ভেবেই না কিনে আমরা ভাবতে পারি, সত্যিই কি জিনিসটি জরুরি? বাচ্চাদের বই-খাতার মলাটে প্লাস্টিকের পরত না দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি। 'ব্যবহার করো এবং ফেলে দাও'-এর পরিবর্তে রিফিল পাল্টে বারবার একটি কলম ব্যবহার করা যায়। খাতার পৃষ্ঠার সম্যক ব্যবহার করা বাচ্চাদের শেখাতে হবে। কোথাও যাওয়ার সময় নিজস্ব গাড়ির পরিবর্তে সার্বজনীন যানবাহন ব্যবহার করা যেতে পারে। মহিলাদের প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবহার (চিরুনী, ক্লিপ, লিপস্টিক ইত্যাদি) সীমিত করতে পারি।

দুর্গাপূজা বা অন্যসময় কেনাকাটার মাত্রা সীমিত রেখে প্যাকেটবন্ধ রাস্তার খাবার কম খেয়েও আমরা আমাদের প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি। প্রথমে দৈনিক প্রয়োজন, তারপর মাসিক, বার্ষিক— এইভাবে হিসাব করে চললে আমরা প্রকৃতির সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার, কার্বন সৃষ্টি কম করতে পারি। আমাদের ব্যবহার থেকে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সতর্ক হবে। একজন সতর্ক উপভোক্তা হিসাবে প্রকৃতি এবং পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধ তখনই হবো, যখন আমরা ভাবব যে আমরাও এই পৃথিবীর বাসিন্দা। এজন্য প্রয়োজন আত্মতুষ্টি এবং সন্তোষ— যা বাহ্যিক জগৎ আমাদের দিতে পারে না। সুতরাং, নিজেদের প্রয়োজন সীমিত করে নিজেদের ভেতরেই যদি অসীমিত আনন্দের উৎস খুঁজে পাই, তাহলে আমাদের প্রয়োজনও সীমিত হবে আর পৃথিবীর দূষণও কম করতে পারব। সন্তানের কাছে মা'র চাহিদা বাহ্যিক বস্তুর প্রতি নয়, শুধু অপার্থিব শান্তির প্রতি। এটুকু দিতে আমরা ধরিত্রীমা'র কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ■

অতিথি কলম

চিদানন্দ রাজঘাট্টা

পাকিস্তানের রটানো কলঙ্ক থেকে মুক্তি

কাশ্মীর আবার অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। ভারতরাষ্ট্রের উজ্জ্বল সুখাবরণের ওপর যেন এক ফোঁটা দুঃখের অশ্রুবিন্দু। ভৌগোলিকতার পরিমাপে কুয়েত বা সোয়াজিল্যান্ডের মাপের এই অঞ্চলটি একটি ক্ষুদ্র কিন্তু সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক এক শ্রেণীর বিচ্ছিন্নতাবাদীর পাকাপাকি আস্তানায় পরিণত হয়েছে। এদের জীবনের লক্ষ্য তথাকথিত 'আজাদি'র ভাবনাকে জিইয়ে রাখা। অনেক সময়ই দেখা যাচ্ছে এই আন্দোলনের নেতাদের কাছে 'আজাদি' এক ধরনের উচ্চ মুনাফা প্রদানকারী ব্যবসা। একটু নজর করলেই দেখা যাবে এই আন্দোলনের নেতারা বিশাল বিত্ত-বৈভবের মধ্যে নিশ্চিত নিরাপত্তায় জীবন কাটাচ্ছে। অশান্তি বিক্ষোভ দেখাতে লেলিয়ে দিচ্ছে গরিব জনতাকে। নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে রাষ্ট্ররক্ষার নিয়মে সংঘর্ষ হলে তারা একে 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' বলে ভূষিত করছে। কিন্তু প্রতিটি চলে যাওয়া বছরের সঙ্গে বিশ্বরাজনীতির আঙিনায় এই আন্দোলনের গুরুত্ব ক্রমহ্রাসমান। কিন্তু পাকিস্তানকে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মরিয়া চেষ্টায় 'কাশ্মীর বনেগা পাকিস্তান' নামক অলীক কিন্তু ধ্বংসাত্মক স্লোগানটিকে জিইয়ে রাখার সব প্রচেষ্টা চালু রাখতে হয়েছে। এই নেতারা অবাক হচ্ছে বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলি কাশ্মীর নিয়ে আর তেমন মাথা ঘামাচ্ছে না কেন? একইরকম অবাক হচ্ছে তাদের পাকিস্তানি মদতদাতারাও। গত দু'দশকের 'বিপ্লবী আন্দোলনে' ১ লক্ষ কাশ্মীরির মৃত্যু হয়েছে এমন একটা হিসেব আলটপকা বাজারে ছেড়ে তার বছর, মাস, দিন ধরে ব্রেক আপ তৈরি হয়েছে। প্রতি মাসে ৪০০ লোক, দিনে ১৪ জন লোক নিহত হওয়ার মতো দগদগে পরিসংখ্যান চাউর করা হচ্ছে। এটি করার একটিই কারণ মিইয়ে যাওয়া গুরুত্ব বা বিশ্ব সহানুভূতি যদি জাগিয়ে তোলা যায়।

> " দুনিয়াব্যাপী পাকিস্তান ঘৃণিত হচ্ছে তাদের দেশের কিছু কর্তাব্যক্তিদের মানসিকতার ফলে। এদের বক্তব্য, আচার-আচরণ ও কর্মপদ্ধতি দেশের সংবিধানকে অগ্রাহ্য করে চরমপন্থার দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে এটুকু বোঝা যায় যে এই দেশটি পাকাপাকিভাবে একটি ক্ষয়িষ্ণু দেশের তকমাধারী হতে চলেছে। "

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! বাস্তবে দিন-দুনিয়ায় কোনো উচ্চবাচ্য হচ্ছে না। এমনকী প্রায়শই ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওপর অত্যাচার চালানোর যে রুটিন দোষারোপ করা হয় (যদিও তাদের ওপর মূলত পুলিশের কাজ ন্যস্ত করাটা সব সময় ন্যায়সঙ্গত নয়) তাতেও মানবাধিকার সংগঠনগুলির তরফ থেকে তিলমাত্র আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। তাতে অবশ্য ভারতের আত্মতৃপ্ত হয়ে পড়ার কোনো কারণ নেই। বরং এই সুযোগে নিউ দিল্লীর সজাগ হয়ে উঠে সমস্যার সমাধানে ঝাঁপিয়ে পড়ার অবকাশ তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক পরিসরটি আগের থেকে অনেকটাই যখন অনুকূলে। বিশ্ব-দরবারে ভারত যে একটি ক্রমবর্ধমান শক্তি, তা সে কী কৌশলগত, কী কূটনৈতিক, কী অর্থনৈতিক যে কোনো ক্ষেত্রই হোক না কেন সেটি এখন বিশ্ববাসীর স্বীকৃত। সেইসঙ্গে ভারত এটাও প্রমাণ করতে পেরেছে যে এই ধরনের বিভেদমূলক, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের সফল মোকাবিলা করা শুধু নয় পরিণতিতে বিক্ষুব্ধদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার দক্ষতাও তার রয়েছে। ভারতের এই বহুমুখী অগ্রসরতা ও সংহতিকরণের সংশয়াতীত (পঞ্জাব অসম-সহ বহু সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন) পারদর্শিতা উপলব্ধি করেই সমগ্র বিশ্ব জনমত কাশ্মীরের বিষয়ে আজ নিতান্তই ঠাণ্ডা।

বিশ্বের পক্ষে মাথা না ঘামানোর আরও একটি বড় কারণ একবারে হালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী— বিশ্বব্যাপী এখন প্রায় ১০০টি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন জারি আছে। এর মধ্যে ডজন খানেক বেশ বড়সড় ধরনের। তাই বিশ্বের বড় বড় রাজধানী শহরগুলিতে কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো উৎসাহ বা বিন্দুমাত্র কৌতূহল অবশিষ্ট নেই। বিশেষ করে ঘটনটি যখন ভারতের মতো বিশ্ববন্দিত এক বিশাল গণতান্ত্রিক দেশে ঘটছে। মধ্যপ্রাচ্য বা আফ্রিকার দেশগুলিতে ঘটে চলা রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের কাছে কাশ্মীর আন্দোলন তো আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় নজরে বাগানে বেড়ানোর মতো। আলাদাভাবে সেখানে

বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটলেও তার গুরুত্ব ও পরিপ্রেক্ষিত কখনই এক নয়।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে পাকিস্তানের যে সংযোগ এটা তাদের পক্ষে যেমন মৃত্যুকে চুম্বন করার নামান্তর ভারতের পক্ষে তেমনি সব থেকে সুবিধের জায়গা। অবশ্যই কাশ্মীরিদের ন্যায়সঙ্গত দাবি বিক্ষোভ হতাশা থাকতেই পারে। সারা পৃথিবীতে যেখানেই মানুষ সঠিক সুযোগ-সুবিধে থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাদের দাবি আশা আকাঙ্ক্ষার সঠিক পূরণ হয়নি সেখানে বিক্ষোভ দানা বেঁধেছে। সে অসন্তোষ কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে শেতাঙ্গ আমেরিকানদের ক্ষেত্রে যেমন তেমনই বালুচ ও পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দুদের ক্ষেত্রেও সত্যি। আবার ভারতের অভ্যন্তরেও বনবাসী বা মুসলমানদের মধ্যেও রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ক্ষোভ হতাশা থেকে পরিত্রাণ পেতে, তার সমাধান খুঁজতে তুমি যদি এমন একটি দেশের সঙ্গে হাত মেলাতে যাও যার ইতিহাসই হচ্ছে নিজের দেশের সংখ্যালঘুকে নিকেশ করা এমনকী স্বধর্মাবলম্বীকেও নির্বিচারে খুন করা, দেশের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদী ভাড়াটে খুনি তৈরি করা, তাদের অন্য দেশে চালান করে ধ্বংসলীলা চালানো, নরহত্যায় মদত দেওয়া সেক্ষেত্রে সূচনাতেই তোমার প্রয়াস কালিমালিপ্ত হয়ে যাবে। অন্যভাবে বললে দাঁড়ায় শুধুমাত্র দুষ্ট সঙ্গদোষে জন্মলগ্নেই তোমার আন্দোলন অনিবার্য বিনাশের পথে চলেছে।

কল্পিত হারানো ভূমি ফিরে পেতে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা তো বটেই তাদের মদতদাতা পাকিস্তানেরও কোনো বাস্তব ধারণা নেই। আজ সমগ্র বিশ্বের চোখে পাকিস্তান কতটা নেমে গেছে, একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। সদ্য সমাপ্ত জি-২০ সম্মেলনে আমাদের প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা হিসেবে পরোক্ষভাবে পাকিস্তানের নাম উল্লেখ করেন। সেই মুহূর্তে পাকিস্তান যে বিশ্বে কতটা একঘরে হয়ে পড়েছে— তা পরিষ্কার হয়ে যায়। মোদীর এই ইঙ্গিতের প্রত্যুত্তরে পাকিস্তানের চিরাচরিত বন্ধুদেশগুলি— সৌদি আরাবিয়া, তুরস্ক ও চীনের তরফে কোনো মৃদু প্রতিবাদও শোনা যায়নি। জি-২০ ক্লাবের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দাবিকে কেউ ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি যদিও পাকিস্তান জনসংখ্যার নিরিখে বিশ্বের ষষ্ঠতম দেশ। শুধু তাই নয়, জি-২০ সম্মেলনে পাকিস্তানকে সাধারণ পরিদর্শকের মর্যাদা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। অথচ এইবার ছোট ছোট দেশ কাজাকিস্তান, চাদ, ইজিপ্ট আমন্ত্রিত ছিল। এর কারণটি খুব সহজ। পাকিস্তানের বিশ্বকে দেওয়ার মতো কিছু নেই শুধুমাত্র সমস্যা ছাড়া, সেটাও আবার সন্ত্রাসবাদ সম্বল করে অন্য দেশের ভূখণ্ড অধিকার করার মতো আগ্রাসী মনোভাবকে যদি মান্যতা দেওয়া যায়। কাশ্মীর শুধু নয় সংলগ্ন বেশ কিছু অঞ্চল ঘিরে নিজেদের কৌশলগত গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা প্রমাণ করার আধিপত্যবাদী মানসিকতা থেকে পাকিস্তান কাশ্মীরে আন্দোলনকেই শুধু কলঙ্কিত করেনি সন্ত্রাসবাদকে প্রত্যক্ষ মদত দেওয়ার বিষক্রিয়ায় নিজেদের সুনামও দূষিত করে ফেলেছে। আজ দুনিয়াব্যাপী পাকিস্তান ঘৃণিত হচ্ছে তাদের দেশের কিছু কর্তাব্যক্তিদের মানসিকতার ফলে। এদের বক্তব্য, আচার-আচরণ ও কর্মপদ্ধতি দেশের সংবিধানকে অগ্রাহ্য করে চরমপন্থার দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে এটুকু বোঝা যায় যে এই দেশটি পাকাপাকিভাবে একটি ক্ষয়িষ্ণু দেশের তকমাধারী হতে চলেছে। ভাবলে অবাক হতে হয় খুব শিগ্‌গিরই আমাদের মহারাষ্ট্র রাজ্যের সামগ্রিক অর্থনীতির বহর পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে যাবে। বিশ্বের কূটনীতিকদের কাছে সম্প্রতি পাকিস্তানের ২২ জন সাংসদকে বিশ্বের নানান দেশের রাজনীতিতে কাশ্মীর সমস্যার হাল হকিকত ওয়াকিবহাল করতে পাঠানোর খবরে তুমুল হাসির খোরাক জুটেছে। কেননা বিভিন্ন টিভি সাক্ষাৎকারে দেওয়া তাদের মন্তব্যে পরিষ্কার হয়ে গেছে এই পাকিস্তানি আইন প্রণেতাদের কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে কোনো ভাসা ভাসা ধারণাও নেই। কাশ্মীর সংক্রান্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘে গৃহীত যে 'তথাকথিত' প্রস্তাব নিয়ে পাকিস্তান লাগাতার মিথ্যে প্রচার করে সে সম্পর্কে তাঁরা কিছু জানেন না। তাঁদের অজ্ঞতা সীমাহীন। পাকিস্তান তার দেশবাসীকে কোনোকালেই সত্যটা বলেনি সেই অর্থে ভারতও বিশ্বকে ওয়াকিবহাল করেনি যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রস্তাবটির পালন কখনই বাধ্যতামূলক ছিল না। শুধু তাই নয়, এই প্রস্তাবের যে মূল সূত্র অর্থাৎ 'গণভোট' সেটি তখনই নেওয়া হবে যখন সমগ্র কাশ্মীর থেকে পাকিস্তান তার শেষ জবরদখলকারী সেনা ও জনতাকে সরিয়ে নেবে (পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর সহ)। পাকিস্তান এটাও বলেনি যে পাকিস্তান রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রস্তাবকে অবমাননা করে কীভাবে অধিকৃত ভূখণ্ডের একটা বড় অংশ চীনকে দীর্ঘদিন আগে গোপনে হস্তান্তর করে দিয়েছে। সেখানে বড় বড় রাস্তা, বিশাল পরিকাঠামো নির্মিত হয়েছে, হচ্ছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রস্তাব ভাগাড়ে চলে গেছে। এখন শুধু চলছে নির্জলা মিথ্যা।

বিভিন্ন সময়ের শাসকদের নির্দেশে পাকিস্তানবাসীকে বোঝানো হয়েছে তারা ভারতের চারটি আগ্রাসী যুদ্ধকে সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে। দিল্লীই পাকিস্তানকে বরাবর আক্রমণ করে এসেছে। একবারও দেশ পরিচালকরা উচ্চারণ করেনি ভারতের মহানুভবতার কথা যখন ভারত তার জলভাণ্ডার সে দেশে পাঠিয়ে দেশটির বাঁচার ক্ষেত্রে বরাবরের সুবিধে করে দিয়েছে। সেজন্য কখনও দাদাগিরিও দেখায়নি সমান সমান মর্যাদায় বাঁচতে চেয়েছে, কারণ ভারত বিশ্বাস করে এসেছে দু'দেশের মানুষই একই পূর্বপুরুষদের পরম্পরার ধারক ও বাহক।

কিন্তু এই ধৈর্যশীলতা ও নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখার দিন বোধহয় শেষ হতে চলেছে। বিগত কয়েক সপ্তাহের ঘটনাপ্রবাহ যে দিকে মোড় নিচ্ছে তাতে মনে হয় নয়া দিল্লীর এবার আরও কড়া কূটনৈতিক কৌশল নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এই প্রক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ হলো আন্তর্জাতিক forum-গুলিতে সরাসরি পাকিস্তানের নাম নিয়ে তাকে অপদস্থ করা। সমগ্র বিশ্বের চোখে সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া খরচ বিপুল। এইভাবে পাকিস্তানকে দুনিয়ায় চরম একঘরে করে কাশ্মীরিদের বোঝানো যে এমন কুখ্যাত ও ধ্বংসন্মুখ একটি দেশের সঙ্গে সঙ্গত করা মানে নিজেদেরও রসাতলে পাঠানো। কাশ্মীর সমস্যার সুরাহা করতে এটি বিকল্প পথ সন্ধান হতেও পারে।

কাশ্মীর সমস্যা
একজন ভারতীয় নাগরিকের উপলব্ধি

প্রণব দত্তমজুমদার

টানা দু'মাস ধরে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের তাণ্ডব চলছে। এর আগে ২০১০ সালে একবার বহুদিন ধরে এরকম ব্যাপক সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চলেছিল। তার আগে ১৯৯০ সালে খুন, জখম, ধর্ষণ

ইত্যাদির মাধ্যমে ভয়াবহ সন্ত্রাস করে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ভিটেমাটি উচ্ছেদ করে নিজের দেশেই উদ্বাস্তু বানিয়ে ছেড়েছে।

আমাদের দেশের এক ধরনের রাজনৈতিক নেতা এবং বুদ্ধিজীবী এই সমস্ত সন্ত্রাসবাদীর প্রতি সহানুভূতি সুলভ মনোভাব দেখিয়ে চলেছে। মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে এদের কার্যকলাপকে নৈতিক সমর্থন দিয়ে চলেছে। যেহেতু এখন কাশ্মীরে পিডিপি-বিজেপি জোট সরকার চলছে সুতরাং এরা বিজেপি-র কেন্দ্রীয় সরকারের উপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। এমন বক্তব্য রাখছে যেন কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সমস্ত দায় ভারত সরকারের। কেন কাশ্মীরের ছেলেরা মারা যাচ্ছে, আহত হচ্ছে, কেন পেলেটগান ব্যবহার করা হচ্ছে ইত্যাদি নানারকম মানবাধিকারের কথা বলে হৈচৈ ফেলে দিয়েছে! কিন্তু ওইসব ছেলেরা কেন নিরাপত্তারক্ষীদের উপর ইট, পাথর ছুঁড়ছে, কেন গ্রেনেড ছুঁড়ছে, কেন নিরাপত্তারক্ষীদের হত্যা করছে— এসব কথা রাজনৈতিক নেতারা, বুদ্ধিজীবীরা একবারও বলছেন না। নিরাপত্তারক্ষীদের কি মানবাধিকার নেই? তাদের কি সমাজ সংসার নেই? তারা কি মানুষ নয়? কী অদ্ভুত মানবতাবোধ! সংসদের ভিতরে, বাইরে মিডিয়াতে বিরোধীপক্ষের রাজনৈতিক নেতারা এবং তথাকথিত মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবীরা ভারত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছে।

গত ৪ সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে এক উচ্চ পর্যায়ের সর্বদলীয় প্রতিনিধিবৃন্দ কাশ্মীরে যান। প্রতিনিধি দলে ছিলেন— ভারতের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেট্‌লি, এনডিএ-র সহযোগী রামবিলাস পাশোয়ান, কংগ্রেস থেকে গুলামনবি আজাদ এবং অম্বিকা সোনি, সিপিএম-এর সীতারাম ইয়েচুরি, সিপিআই-এর ডি. রাজা, জে ডি ইউ-এর শারদ যাদব, এ আই এম আই এম-এর আসাদুদ্দিন ওয়েসি। এইসব বাঘা বাঘা নেতা সারাদিন ধরে উগ্রপন্থীদের নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানি, ইয়াসিন মালিক, ওমর ফারুক আব্দুল গণি ভাট প্রমুখদের দরজায় দরজায় ঘোরেন। কিন্তু এদের কেউ আমাদের নেতাদের পাত্তা দেয়নি, কথাও বলেনি, একরকম মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। এমনকী সীতারাম ইয়েচুরি, ডি. রাজা এবং শারদ যাদব তো অতি উৎসাহে সংসদীয় প্রোটোকল ভেঙে আলাদাভাবে 'জে অ্যান্ড কে লিবারেশন ফ্রন্ট'-এর নেতা ইয়াসিন মালিকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন। ইয়াসিন মালিক এদের পত্রপাঠ বিদায় করে এবং বলে, ভারতীয় সংবিধানের

ফ্রেমওয়ার্কে আলোচনা করতে সে আগ্রহী নয়। বুঝুন ব্যাপারটা। ভারতীয় সংবিধানকেই স্বীকার করে না ইয়াসিন মালিক! অথচ ভারতীয় সংবিধানের ছত্রছায়ায় থেকে, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে, মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে ভারতবর্ষের টাকায় পুষ্ট হয়ে ভারতবিরোধী আন্দোলন করে যাচ্ছে! আর আমাদের দেশের একধরনের রাজনৈতিক নেতা, মেকি বুদ্ধিজীবী এদের নৈতিক সমর্থন করে চলেছে!

১২০ কোটি ভারতবাসীর সংসদের প্রতিনিধিদের প্রত্যাখ্যান করে ভারতের সংসদকে শুধু অপমান নয়, আসলে এরা সমস্ত ভারতবাসীকে উপেক্ষা এবং অপমান করেছে। অথচ তারপরেও দেখছি টিভিতে, খবরের কাগজে একধরনের রাজনৈতিক নেতা এবং বুদ্ধিজীবী বলে চলেছে--- আলোচনার এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

এইসব ভণ্ড রাজনৈতিক নেতা এবং ভণ্ড বুদ্ধিজীবী নিজেদের রাজনৈতিক এবং নানাবিধ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অনবরত এসব চাতুরি করে চলেছে। এরা খুব ভাল করে জানে এভাবে সমস্যা মিটবে না এবং এরা চায়ও না যে সমস্যা মিটুক। তাহলে এদের ধান্দা বন্ধ হয়ে যাবে। এবার সত্য কথাটা বলবার সময় হয়ে গেছে। কোদালকে খুন্তি বলে আর চালানো যাবে না। এভাবে সন্ত্রাসবাদীদের তোয়াজ করে কাশ্মীরের সমস্যা মেটানো যাবে না। কাশ্মীরে যারা সন্ত্রাস চালাচ্ছে তারা কাশ্মীরে উন্নয়নের জন্য বা কাশ্মীরের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া চাকরি-বাকরির জন্য বা কাশ্মীরের শিল্পের জন্য বা কাশ্মীরের অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য লড়াই করছে না। তাদের অ্যাজেন্ডা আলাদা। সেটাতে যতদিন না ওরা সফল হচ্ছে ততদিন এসব সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ওরা চালিয়েই যাবে, কিছুতেই থামবে না।

কী সেই অ্যাজেন্ডা? কাশ্মীরি সন্ত্রাসবাদীদের অ্যাজেন্ডা হলো 'জিহাদ'। ইসলামি দর্শনে 'জিহাদ' কী, তার কিছুটা তাত্ত্বিক আলোচনা করলে অনায়াসেই বোঝা যাবে কাশ্মীরের সন্ত্রাসের সঙ্গে এর সাযুজ্য কোথায়।

'জিহাদ' হলো ইসলামের মূল বিষয়বস্তু। জিহাদ হলো অ-মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক যুদ্ধ যার সাহায্যে 'দুনিয়াজোড়া ইসলামের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং ইসলাম ছাড়া আর সব ধর্মকে শেষ করে আল্লার ধর্মকে পৃথিবীর একমাত্র ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। (কোরান ৮/৩৯)।' ইসলামের মতে পৃথিবীতে দু'রকমের দেশ আছে--- 'দার-উল-ইসলাম' ও 'দার-উল্-হার্ব'। 'দার-উল- ইসলাম' হলো সেই সমস্ত দেশ যা ইতিমধ্যে মুসলমানদের অধিকারে চলে এসেছে এবং যেখানে ইসলামি সরকার ও ইসলামি আইন কানুন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর 'দার-উল-হার্ব' হলো সেই সমস্ত দেশ যেখানে মুসলমানরা অ-মুসলমান (কাফের)-দের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে সেই দেশকে 'দার-উল- ইসলাম'-এ পরিণত করার জন্য। তাই আল্লা কোরানে মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন— ''তোমরা তাদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যতদিন না অশান্তি দূর হয় ও আল্লার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় (কোরান-৮/৩৯)।'' জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের বলা হয় 'মুজাহিদ' বা আল্লার সৈনিক বহুবচনে 'মুজাহিদিন'। আল্লার অন্তিম ইচ্ছে হলো মুজাহিদিনদের সাহায্যে পৃথিবীর আর সমস্ত ধর্মকে বিনাশ করে সারা বিশ্বে ইসলামের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমানের কাছে 'মুজাহিদ' হয়ে 'জিহাদ' করার চেয়ে বড় পুণ্য আর কিছুতেই নেই। স্বামী বিবেকানন্দ ইসলামি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন 'তাহাদের (মুসলমানদের) মূলমন্ত্র আল্লা এক এবং মহম্মদই একমাত্র পয়গম্বর। যাহা কিছু ইহার বহির্ভূত সে সমস্ত কেবল খারাপই নহে, উপরন্তু সে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিতে হইবে। যে কোনো পুরুষ বা নারী এইমতে সামান্য অবিশ্বাসী তাহাকেই নিমেষে হত্যা করিতে হইবে; যাহা কিছু এই উপাসনা পদ্ধতির বহির্ভূত তাহাকেই অবিলম্বে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে; যে কোনো গ্রন্থে অন্যরূপ মত প্রচার করা হইয়াছে সেগুলিকে দগ্ধ করিতে হইবে। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ব্যাপক এলাকার দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া রক্তের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। ইহাই মুসলমান ধর্ম।''

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'কালান্তর' প্রবন্ধে বলেছেন, ''মুসলমানদের সঙ্গে যতই বন্ধুত্ব কর না কেন, তাদের যতই সাহায্য কর না কেন তারা অমুসলমানকে কিছুতেই বন্ধু বলে মনের থেকে গ্রহণ করবে না, তাদের সঙ্গে মিলবার একটাই উপায় তা হলো মুসলমান হয়ে যাওয়া। সুতরাং; মুসলমান ধর্ম না গ্রহণ করে তুমি তাদের যতই ভালবাস না কেন, তুমি তাদের শত্রুই থেকে গেলে।''

আনোয়ার শেখ একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এবং লেখক। তিনি 'ইসলাম' নামক একটি পুস্তিকা লিখেছেন যেটা The Principality Publishers (U.K.) থেকে ছাপা হয়েছে। সেই পুস্তিকার চ্যাপ্টার-৪ এর ৩৪ থেকে ৩৬ পাতায় তিনি যা লিখেছেন তা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিলে সদিগ্ধমনা পাঠক-পাঠিকাদের মনের সন্দেহ দূর হতে পারে। বাংলাতে তর্জমা না করে ইংরেজিতেই তুলে দিচ্ছি : ''The Prophet formulated the doctrine of Jihad, i.e. fighting against the unbelievers for taking over their country, personal possessions and women, and subjugating them to the Arabian hegemony. This is how the doctrine of Jihand Works.'' (Women : 90)

এরকম অনেক আয়াত/সুরা উদ্ধৃত করে শেষে আনোয়ার শেখ লিখছেন— 'The Prophet's assertion that the Muslims are one nation and the infidefls are another, accelerated the process of the foreign Muslims unity with the Arabss... As result, the foreign Muslims have little or no loyalty to their own motherlands for being devoid of national howour.'

এই শেষ পংক্তিতে আনোয়ার শেখের যে মূল্যায়ন প্রকাশ হয়েছে ইসলাম সম্বন্ধে, তা মিলে যাচ্ছে প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের এক বিখ্যাত মুসলিম ব্যক্তিত্বের বক্তব্যের সঙ্গে। সেই বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হলেন স্যার সৈয়দ

আহম্মদ খান। যিনি ১৮৯৩ সালে 'মহামেডান পেট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেছিলেন। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠন হলে তাঁকে তাতে যোগদান করতে আহ্বান করা হয়। তার প্রেক্ষিতে ১৮৮৬ সালে তিনি বলেন— ''আমাদের হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক পৃথক শাসন ও শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং আমরা ভারতীয় জাতির লোক নই, বিদেশি জাতির মানুষ, হিন্দুস্থানে বাস করছি।''

কট্টর ইসলামপন্থী মুসলমানদের এই মনোভাব ইসলামের দর্শন থেকেই এসেছে। আনোয়ার শেখ ইসলাম দর্শন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন পৃথিবীর যে ভূখণ্ডেই মুসলমানরা থাকুক না কেন তারা এক 'মুসলিম নেশন'-এর মানুষ যার কেন্দ্রবিন্দু আরবের মক্কায়। তাদের আনুগত্য একমাত্র তার কাছেই আর কোথাও নয়। ভারতে বসবাসকারী কট্টর ইসলামপন্থী মানুষরাও ইসলাম অনুযায়ী ভারতবর্ষকে তাদের 'নেশন' মনে করে না। কাজেই ভারতের প্রতি তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই এবং ভারতের উন্নয়ন, প্রগতি, বিকাশ এসবের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ নেই।

কট্টর ইসলামপন্থী 'হুরিয়ত' নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানির মনোভাবও হুবহু তাই। গিলানির মত ও পথ জানার জন্য একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও কলামিস্ট শ্রীরামচন্দ্র গুহর একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে ইংরেজি দৈনিক 'The Telegraph'-এ ০৩.৯.২০১৬ তারিখে 'The Cause of Problems' নামে। লেখাটিতে শ্রীগুহ কাশ্মীর সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে সৈয়দ আলি শাহ গিলানি সম্বন্ধে দিক্‌পাত করেছেন। ২০১০ সালে কাশ্মীরে যে ব্যাপক সন্ত্রাস হয়েছিল তার প্রেক্ষিতে ওই সময় একজন স্কলার শ্রীযোগীন্দর সিকান্দ গিলানির একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। তার উল্লেখ শ্রীগুহর লেখাটিতে আছে। সেই সাক্ষাৎকারে গিলানি কী বলেছিলেন তা তুলে ধরলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে এইসব উগ্রপন্থী নেতারা কাশ্মীরে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ভারতে সংবিধানের প্রতি তাদের অনুগত্য বা শ্রদ্ধা কিছুই নেই। আর সে কারণেই ৪ সেপ্টেম্বর ওরা ভারতীয় সংসদের প্রতিনিধিদের উপেক্ষা করে। আপমান করে ওদের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

শ্রীরামচন্দ্র গুহর লেখাটি যেহেতু ইংরেজিতে ছিল তাই গিলানির বক্তব্য আমি ইংরেজিতে তুলে দিচ্ছি। যোগীন্দর সিকান্দের সাক্ষাৎকারের প্রেক্ষিতে গিলানি খুব স্পষ্ট করে বলেছেন, ''Muslim must follow the guidance of Islam in every action of theirs—not just in prayers but also in matters such as war and peace, trade, international relations and so on because Islam is a complete way of life.''

''Therefore, the duty of Muslims everywhere must be to work to establish an Inslamic dispensation in the lands where they live so that they can lead their lives fully in accordance with Islam and its laws.'' একদম জলের মতো পরিষ্কার যে 'হুরিয়ত' নেতা গিলানি কাশ্মীরে ইস্‌লামের শাসন প্রবর্তন করার জন্য কাশ্মীরের বালক, কিশোর, যুবকদের জিহাদের মন্ত্রে ক্ষেপিয়ে তুলছে। গিলানি তার বক্তব্যে কোনো ভণ্ডামি করছে না। সে ইসলাম অনুযায়ী তার বক্তব্য রেখেছে। ভণ্ডামি করছে আমাদের এক ধরনের রাজনৈতিক নেতা এবং একধরনের বুদ্ধিজীবী। তারা কাশ্মীরের সন্ত্রাসের 'জিহাদি' চেহারাটিকে নানারকম অপযুক্তির সাহায্যে আড়াল করছে নিজেদের ধান্দার জন্য। এদের এত নীচু মনোবৃত্তি যে নিজেদের ধান্দা চরিতার্থ করার জন্য নিজের দেশকে বলি দিতেও প্রস্তুত। এরা আসলে দেশদ্রোহী।

শ্রীরামচন্দ্র গুহ তাঁর লেখাটিতে যোগীন্দর সিকান্দের ওই সাক্ষাৎকার ছাড়াও সিকান্দের লেখা আর একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করেন যা ২০১০ সালের ২ অক্টোবর 'The Economic and Political Weekly'-তে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির নাম 'Jihad, Islam and Kashmir : Syed Ali Shah Geelani's Political Project. ওই প্রবন্ধে গিলানির দুটি চিঠির উল্লেখ আছে। প্রথম চিঠিটি ১৯৯০ সালে তৎকালীন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাকে লেখা। তাতে গিলানি লেখে ''The Muslims are a complete separate nation on the basis of their religion, culture, civilisation, customs and practices and thought. Their nationalism and foundation of their unity cannot be based on their houseland, race, language, colour or ecomomic system. Rather, the basis of their unity is Islam and Islam alone, and their belief that there is no God but Allah and that Muhammad is Allah's prophet.'' গিলানির দ্বিতীয় যে চিঠির উল্লেখ আছে তা ১৯৯৩ সালে লেখা। লিখেছিল পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে, যিনি এখনও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। তাতে গিলানি লেখে, পাকিস্তান হচ্ছে— ''Land of dreams of all Kashmiris because it was won in the name of Islam.''

পাঠক-পাঠিকাদের কি কোনো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে যে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের পিছনে কোন উদ্দেশ্য কাজ করছে? অথচ আমাদের দেশের একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা এবং বুদ্ধিজীবীদের বিদ্যা, বুদ্ধি পাণ্ডিত্য, জ্ঞান এত প্রখর যে তাঁরা এটা বুঝেই উঠতে পারছেন না! ভণ্ডামির একটা সীমা থাকা উচিত। এরা ভাবছেন দেশের সবাই বোকা এরাই শুধু বোদ্ধা। এরা আসলে দেশের মানুষকে বোকা ভেবে দেশের মানুষকে অপমান করছেন। এইসব ভণ্ডদের মুখোশ খুলে দিতে হবে। এইসব ভণ্ডরা গণতন্ত্রের নামে, সেকুলারিজম্-এর নামে, ফ্রিডম্ অব এক্সপ্রেশন-এর নামে, মানবাধিকারের নামে নানারকম যুক্তিজাল বিস্তার করে, তোয়াজের রাজনীতি করে ভোটের রাজনীতি করছে, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করছে। এই মুহূর্তের লাভের জন্য এরা এত মশগুল যে ভবিষ্যতে দেশের যে কী অবস্থা হবে— সেসব ভাবার মতো

অবকাশ বা ইচ্ছা এদের নেই। এরা অত্যন্ত নীচু মানসিকতার লোক। এরা প্রকাশ্যে বড় বড় আদর্শের বুলি আউড়ায় অথচ আড়ালে নিজেদের স্বার্থ গুছিয়ে নেয়। এই ধরনের নেতারাই প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে 'খিলাফত মুভমেন্ট'কে মান্যতা দিয়েছিল একটি সম্প্রদায়কে তোয়াজ করে নিজেদের দিকে রাখবে বলে, অথচ এই আন্দোলনটি ছিল একটি সাম্প্রদায়িক আন্দোলন। এই ধরনের নেতারাই তখন দক্ষিণ ভারতে 'মোপালা'দের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে কোনো দোষ খুঁজে পায়নি— অথচ হাজার হাজার হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছিল, হাজার হাজার হিন্দু রমণী ধর্ষিতা হয়েছিল। এরাই 'সুরাবর্দীকে' শহিদ আখ্যায় ভূষিত করেছিল যে সুরাবর্দীর অঙ্গুলী হেলনে প্রথমে কলকাতায় এবং পূর্ববঙ্গে পরে হাজার হাজার হিন্দুকে হত্যা করা হয় হাজার হাজার হিন্দু রমণী ধর্ষিতা হয় আর কোটির উপর হিন্দু উদ্বাস্তু হয়ে ভারতবর্ষে আসে। বহু তোয়াজ করেও বহু জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা বলেও এরা দেশভাগ আটকাতে পারেনি। ইসলামি দর্শন মেনে ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করতে হয়েছিল। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হলেও এইসব মহানুভব রাজনৈতিক নেতা ভারতবর্ষীয় অংশটিকে 'সেকুলার' করলেন তোয়াজের রাজনীতি করবার জন্যই। ঠিক আছে, সভ্য মানুষেরা সেকুলার রাষ্ট্রব্যবস্থা মেনে নেবেন তাতে আপত্তি নেই। এদের ভণ্ডামিটা দেখুন! সভ্য সমাজব্যবস্থা চালু করার জন্য, পলিগ্যামি বন্ধ করার জন্য 'হিন্দু ম্যারেজ কোড' হলো, অথচ একই সভ্যদেশের মধ্যে আর একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় ব্যবস্থা চালু থাকল। তাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি চারটি বিয়ে করতে পারে। এই সভ্যদেশের একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুনারীগমন সভ্য রাষ্ট্রের কর্তারা মেনে নিলেন। সেকুলার রাষ্ট্রের সব নাগরিক ইসলামি শাসন থেকে মুক্ত হতে পারল না। ইসলাম ধর্মের শিকলটা সেকুলার রাষ্ট্রের পায়ে বাঁধাই থাকলো। কী অদ্ভুত ব্যবস্থা! এরা আবার সেকুলার সেকুলার বলে গলা ফুলিয়ে সব মহৎ কথাবার্তা বলে ভাষণ দেয়! সেকুলারবাদী পণ্ডিতরা দেশে 'কমন সিভিল কোড' চালু করতে পারলেন না কেন? ধর্মের ভিত্তিতে দেশ যখন ভাগ হয়েইছিল তখন এইসব সেকুলারবাদীরা কেন বলতে পারেননি যে রাষ্ট্রব্যবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা ইত্যাদি পুরোপুরি ইসলাম মেনে চলবে এরকম যারা চাও তাদের জন্য আলাদা দেশ তো মেনেই নেওয়া হয়েছে সেখানেই যাও; আর ভারতবর্ষে থাকতে হলে সকলের জন্য এক ব্যবস্থা 'কমন সিভিল কোড' মেনে চলতে হবে। ধর্মীয় ভিত্তিতে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা এখানে কার্যকরী হবে না। সেকুলার ভারতবর্ষে 'শরিয়তে'র বীজ বপন করা চলবে না— একথাটা দেশ ভাগের সময় সেকুলারবাদী নেতারা কেন বলতে পারেননি? সেকুলার ভারতবর্ষে কেন 'কমন সিভিল কোড' হলো না বলুন তো? এইসব ভণ্ড সেকুলারবাদীদের মুখোশ এখন খুলে দিতে হবে।

আমাদের ভারতবর্ষে প্রচুর শিক্ষিত, বিদ্বান, বুদ্ধিমান উচ্চপদে আসীন প্রগতিশীল মুসলমান আছেন। ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাঁদের আস্থা আছে। তাঁরা ইসলামের কট্টরপন্থায় বিশ্বাসী নন। ইসলামের কট্টর নিয়মে চলা রাষ্ট্রব্যবস্থা অপেক্ষা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা যে ভাল সেটা তাঁরা বোঝেন। তারা ইসলামের 'সুফি' ধারাটিকে শ্রদ্ধা করেন যে ধারাটি ভারতবর্ষের বহুত্ববাদ সংস্কৃতির সঙ্গে মিল খায়। কিন্তু এরা ইসলামের কট্টরপন্থী ধারা যা 'ওয়াহাবি' বা 'সালাফি' ধারা বলে পরিচিত তাদের ভয়ে মুখ খোলেন না। এই বিদ্বান প্রগতিশীল মুসলমানদেরও কিন্তু আর চুপ করে থাকলে হবে না। ওরা যে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, চিন্তায়, মননে এই কট্টরপন্থী মৌলবিদের থেকে অনেক এগিয়ে আছেন, তাঁরা যে তাঁদের মগজ মৌলবিদের কাছে গচ্ছিত রাখবেন না সেটা বোঝাতে হবে। এইসব সাম্প্রদায়িক মৌলবিদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

সেইসঙ্গে যে সব ভণ্ড রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং ভণ্ড বুদ্ধিজীবী গণতন্ত্রের নামে, সেকুলারিজমের নামে, বাক্‌স্বাধীনতার নামে, মানবাধিকারের নামে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফাঁকফোঁকরকে কাজে লাগিয়ে এইসব মৌলবাদী শক্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে তাদেরও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং দরকারে কঠিন শাস্তি দিতে হবে। তা করবার জন্য যদি কিছু সংবিধানের সংশোধন করতে হয় বা নতুন আইন প্রণয়ন করতে হয় তাঁর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সারা দেশে 'ইউনিফর্ম সিভিল কোড' যাতে চালু হয় তার জন্য তীব্র জনমত গঠন করতে হবে। গণতান্ত্রিক আইন কানুনের যে ফাঁকফোঁকর দিয়ে দেশের অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব নষ্ট করার চেষ্টা চলছে সেগুলোকে সংশোধন করতে হবে। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের জন্য সংবিধানের বিশেষধারা '৩৭০ ধারা' বাতিলের জন্য জনমত গঠনের চেষ্টা করতে হবে। শরিয়তের যেসব নিয়মকালুন ভারতবর্ষের গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে ক্ষতিকর সেসব নিয়মকানুনকে আইনি বৈধতা দেওয়া চলবে না। সেসব যাদের কাছে অবশ্য পালনীয় তাদের জন্য স্বাধীনতার সময় আলাদা ভূখণ্ড ভাগ করে দেওয়া হয়েছে— তারা সেখানে যেতে পারে কেউ তাদের মাথার দিব্বি দেয়নি 'সেকুলার' ভারতবর্ষে থাকার জন্য। ভারতবর্ষটা তাদের জন্যই যারা ভারতবর্ষকে নিজের 'নেশন' ভাববে। ভারতবর্ষের পতাকাকে সম্মান করবে এবং ভারতভূমিকে 'মা' বলে ভাববে। এর মধ্যে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না।

বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। তার আগে প্রায় আটশো বছর ধরে মুসলমান সুলতান, বাদশা, নবাবরা ভারতবর্ষীয়দের গোলাম বানিয়ে রেখেছিল, তারপর প্রায় তিনশো বছর ইংরেজরা ভারতবর্ষীয়দের অত্যাচার ও শোষণ করেছে। ভারতবর্ষের নাগরিকরা কি আবার গোলাম হয়ে ক্রীতদাসের জীবনযাপন করতে চান? একটু ভাবুন। এখনই যদি ভারতবর্ষের নাগরিকরা সচেতন না হন তবে তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধর্মনাশ অথবা গোলামি থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। সত্যিকারের ইতিহাস পাঠ করলে এই উপলব্ধিই হবে।

তথ্যসূত্র :

১. ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী— এক নজরে ইসলাম। ২. সুধীর পাল— ইসলামের স্বরূপ। ৩. সাপ্তাহিক বর্তমান (১৯.৩.২০১৬)।

পড়ন্তবেলায় মধ্যাহ্নের আলো

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পুরো নাম গঙ্গুবাই নিভরুত্তি ভাম্বুরে। বয়েস চুরানব্বই। এই বয়েসে মহিলারা নাতিনাতনিদের ঠাকুমার ঝুলির গল্প শোনান। কম শোনা কান আর ঝাপসা দেখা চোখ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকেন। পরনির্ভর হতে হতে বাড়ির কোনো এক উপেক্ষিত কোণে নির্বাসিত হয়ে মুক্তি, থুড়ি মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে শুরু করেন।

কিন্তু গঙ্গুবাই সে পাঠশালায় পড়েননি। পুনে জেলার খেড় তালুকের অন্তর্গত ভাম্বুরওয়াদি গ্রাম— গঙ্গুবাই সেখানকার সরপঞ্চ নির্বাচিত হয়েছেন। ফলাফল ঘোষিত হবার পর থেকেই তিনি অভিনন্দনের বন্যায় ভাসছেন। ভক্তদের দলে পঞ্চায়েতের সহকর্মীরা তো আছেনই, খবর পেয়ে মিডিয়া ও বিভিন্ন কাগজের কলমচিরাও জুটে গেছে। সকলেরই প্রশ্ন, এই বয়সে এত বড়ো দায়িত্ব গঙ্গুবাই কেমন করে সামলাবেন! সেপ্টেম্বরের রোদে সারা গ্রাম টহল

দিয়ে এসে গঙ্গুবাই বললেন, 'আমি তোমাদের কাউকে হতাশ করব না। আমি এখনও একজন যুবতীর মতো হাঁটতে পারি। সারাদিন বকবক করলেও ক্লান্ত লাগে না।... আরও শুনবে? বৃষ্টি বা রোদ কিছুই আমাকে কাবু করতে পারে না।'

সারা ভাম্বুরওয়াদি গঙ্গুবাইকে 'আই' বলে ডাকে। মরাঠিতে 'আই' মানে মা। কথা বলতে বলতে হঠাৎই 'আই' ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বলেন, 'এখন কাজের সময়। আমাকে অনেক কিছু করতে হবে। শুধুমাত্র হওয়ার জন্য সরপঞ্চ হয়ে কোনো লাভ নেই।' জরুরি কয়েকটি কাজ সহকর্মীদের বুঝিয়ে দিয়ে মিডিয়ার সঙ্গে একনাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলে যান। এক সময় রসিকতা করে বলে ওঠেন, 'কথা বলতে আমার ভালো লাগে। কানে ভালো শুনি তো, যে যা বলে বুঝতে অসুবিধে হয় না।'

সবে দায়িত্ব নিয়েছেন। কিন্তু এরই মধ্যে একটি নীল নকশা তৈরি করে ফেলেছেন। ভাম্বুরওয়াদি পঞ্চায়েতের অধীন সাতটি গ্রামের আড়াইশো চাষি পরিবারকে অগ্রাধিকার দিতে চান গঙ্গুবাই। এইসব গ্রামে মোট কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ ১০০০ হেক্টর। কিন্তু বছরে আট মাস পর্যাপ্ত জল না মেলায় চাষ করে চাষির লাভ হয় না। অথচ জলের অভাব থাকার কথাই নয়। গঙ্গুবাই-য়ের পৌত্র রাহুল ভাম্বুরে জানালেন, 'কৃষিজমির মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে খাল। কিন্তু চাষিরা জলের একটা ফোটাও পায় না।'

গঙ্গুবাই কথাটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কানে তুলতে চান। জল কীভাবে ক্ষেতে পৌঁছবে তার একটা ছকও তিনি করে রেখেছেন। মাটির নীচে পাইপলাইন বসিয়ে খালের জল জমিতে পাঠানো যেতে পারে কিংবা চাসগামান ড্যামের জলও সেচের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। তাঁর কথায়, 'আমি খুব শীগগির গ্রামবাসীদের তরফে প্রধানমন্ত্রীকে একটা চিঠি লিখব।' কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যদি সে চিঠির উত্তর না দেন! প্রশ্নটা মাছির মতো উড়িয়ে দেন গঙ্গুবাই, 'কেন দেবেন না! প্রধানমন্ত্রী তো আমার ছেলের মতো। আমার বড়োটির বয়েস ৬৫ বছর। শুনেছি প্রধানমন্ত্রীরও তাই। আমি জানি চাষিদের দুঃখকষ্টের কথা তিনি কিছুতেই ফেলতে পারবেন না।' জলসেচের ব্যবস্থা উন্নত করা ছাড়াও গঙ্গুবাই নিকাশি ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে চান। এছাড়া তাঁর পরিকল্পনায় রয়েছে শৌচালয় ও রাস্তাঘাট নির্মাণের মতো কর্মসূচি। ইন্টারভিউ শেষ। ঘড়ি বলছে বিকেল প্রায় শেষ হয়ে এল। কিন্তু চোখের সামনে মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তি। বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝখান থেকে কেউ একজন আবার জানতে চাইল, গঙ্গুবাই কি এতসব কাজ এই বয়েসে করতে পারবেন? গঙ্গুবাই হেসে বললেন, 'আমি রোজ ভোর পাঁচটায় উঠি। বাড়ির কাজকর্ম করি। আমার কোনো রোগবালাই নেই। ওষুধও খেতে হয় না'।

ভাম্বুরওয়াদির মানুষ গঙ্গুবাইকে নিয়ে আশাবাদী। তারা জানেন একজন সরপঞ্চ ব্যর্থ হলেও হতে পারেন কিন্তু একজন মা হন না। মায়ের যত্নেই গঙ্গুবাই গ্রামের রক্ষণাবেক্ষণ করতে চান। পাশে চান 'ছেলের মতো' প্রধানমন্ত্রীকে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

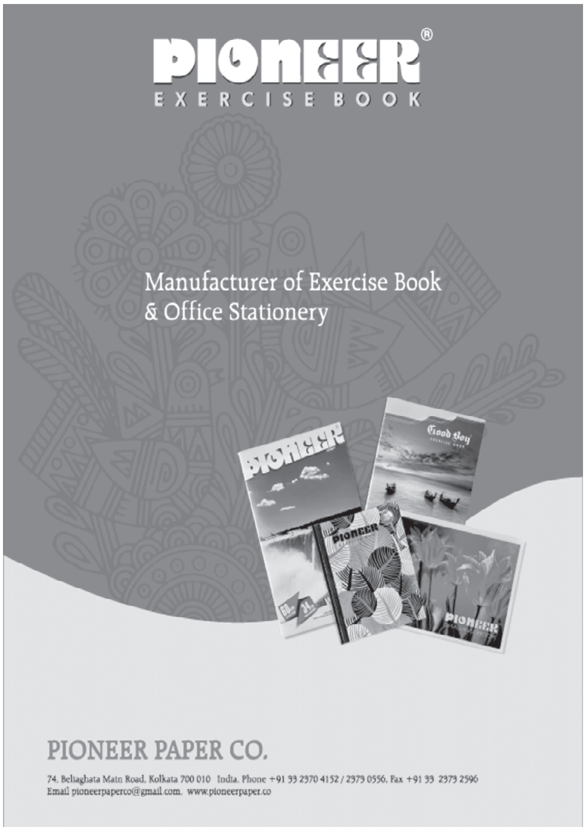

“ তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে শঙ্করাচার্য দক্ষিণ ভারতে নিজ জন্মস্থান থেকে উত্তরে সুদূর হিমালয় পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছেন। এই ভ্রমণকালে যা কিছুর সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছেন সবই তাঁর মনের একটি কেন্দ্রবিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে। সর্বপ্রকার উপাসনা, প্রথমে তিনি যার বিরুদ্ধে ছিলেন, তাও তিনি গ্রহণ করেছিলেন, আর সর্বদাই তা করেছেন এজন্য যে, তিনি উপলব্ধি করেন, ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ রূপ শ্রেষ্ঠ ভাব শুধু বৈদিক আদর্শমাত্র নয়, পুরাণেরও লক্ষ্য।”

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

সমাবেশ সমাচার

জলপাইগুড়িতে কর্নিয়া অন্ধত্বমুক্ত ভারত অভিযান

কর্নিয়া অন্ধত্বমুক্ত ভারত অভিযানের অঙ্গ হিসাবে গত ৩ আগস্ট শ্রী অগ্রসেন স্মৃতি ভবনে জলপাইগুড়ি শাখার উদ্যোগে এক সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ৩০ জন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি এবং দর্শকাসনে প্রায় পাঁচ শতাধিক আমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত ছিলেন। সক্ষমের এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রদীপ চন্দ। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এস এস বি-র প্রাক্তন ডিআইজি সত্যলাল সরকার। এছাড়া মুখ্যবক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য ড. কামতামণি চৌরাশিয়া। উত্তরবঙ্গ প্রান্তের কোষাধ্যক্ষ চন্দন রায় তাঁর ভাষণে ২০১২ সাল থেকে তিনি সক্ষমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং বিশেষ করে 'কর্ণিয়া অন্ধত্বমুক্ত অভিযানের অঙ্গ হিসাবে অন্ধত্ব মুক্ত ভারতবর্ষ গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেন। এই উদ্দেশ্যে 'সক্ষম' আগামী তিন বৎসর বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে জাগরণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণের সর্বাত্মক সহযোগিতা আশা করে। ড. কামতামণি চৌরাশিয়া তাঁর ভাষণে বলেন, ভারতে ২০০৮ সাল থেকে মোট ৪৩টি প্রান্তে লাগাতার কার্যক্রমের জন্য ৪১টি শাখা গঠিত হয়েছে। এই শাখাগুলি কর্নিয়া প্রতিস্থাপন করে অন্ধত্ব দূরীকরণের সাহায্য করবে। এই জন্য চাই দেশের প্রতিটি জেলায় কর্নিয়া প্রতিস্থাপন কেন্দ্র। উপযুক্ত পরিকাঠামো ও চক্ষুব্যাঙ্ক না থাকায় অনেকে মরণোত্তর চক্ষু দান করার মনস্থির করলেও বাস্তবে সেগুলি সফল হচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে তিনি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমারের উচ্চ-প্রশংসা করেন। এই দুটি রাষ্ট্র অন্ধত্ব দূরীকরণে নিজের রাষ্ট্রের চাহিদা পুরণের পরেও অন্য রাষ্ট্রকে বিনা মূল্যে চক্ষুদান করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের হাতে একটি করে স্টিক তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে অনেকেই মরণোত্তর চক্ষু দানের অঙ্গীকার করেন।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে কার্যশালা

ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানমনস্ক ও অনুসন্ধানী হবার দিশা দেবার জন্য, বিদ্যাভারতী সংস্কৃতি শিক্ষা সংস্থান, কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা ও সংস্কৃতি মন্ত্রালয়, ভারত সরকারের যৌথ উদ্যোগে, মুন্সীরহাট বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরের ব্যবস্থাপনায় ব্রাহ্মণপাড়া চিন্তামণি ইনস্টিটিউশনে গত ১১ সেপ্টেম্বর ৭৫০ জন ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ কার্যশালা' সম্পন্ন হয়। সকালে প্রদীপ প্রজ্বলন ও সরস্বতী বন্দনা দিয়ে কার্যশালা শুরু হয়। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন ডাঃ দীপঙ্কর পতি। শিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক কৌশিক প্রামাণিক, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অশোক হালদার, সমীর পাত্র, হিমাংশু দাস

ও শ্রাবন্ত মুখার্জী। তাঁরা ভারতের প্রাচীন ও বর্তমান বিজ্ঞানের গৌরবময় অগ্রগতি ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরেন। বিদ্যাভারতীর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন দেবাংশু পতি ও হাওড়া জেলা কার্যশালা সংযোজক শুভেন্দু সরকার। ছাত্রছাত্রীদের মানপত্র প্রদান ও সমাপ্তি ভাষণ দেন চিন্তামণি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ড. চিন্ময় কুমার ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বিবেকানন্দ বিজ্ঞানমঞ্চের সম্পাদক ড. নিশীথ দাস।

মেদিনীপুরে প্রবীণ নাগরিক সংবর্ধনা

গত ৪ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর নগর তথা মেদিনীপুরবাসীর গৌরব গজেন্দ্রনাথ কুণ্ডু ও তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী ভারতী কুণ্ডুকে প্রবীণ নাগরিক সংবর্ধনা জানায় মেদিনীপুর শিক্ষা ও সেবা ভারতী ট্রাস্ট। বর্ষীয়ান শ্রী কুণ্ডু যুবাবস্থা থেকেই সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত ও একনিষ্ঠ কর্মবীর। তাঁর বাড়ি সঙ্ঘকাজের মহাক্ষেত্র। এই বাড়িতেই প্রবীণ ও নবীন প্রচারকরা অবাধে যাতায়াত করেন। পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডী গ্রামে তাঁদের দান করা কয়েক একর জায়গাতে ছাত্রাবাস ও বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কর্মযজ্ঞ চলছে। তাঁদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁদের নিজস্ব বসতবাটীতে সংবর্ধনার আয়োজন হয়। ৬০ জন স্বয়ংসেবক ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ভাবগম্ভীর পরিবেশে তাঁদের চরণযুগল ধুইয়ে পূজা ও আরতি করা হয়। উত্তরীয় প্রদান করেন ট্রাস্টের সদস্য দুলাল দাঁ। মানপত্র পাঠ করেন প্রবীণ স্বয়সেবক লহর মজুমদার। কম্বল ও শ্রীফল প্রদান করেন ট্রাস্টের সহ-সভাপতি চন্দন কান্তি ভুঁইয়া ও কোষাধ্যক্ষ শেখররঞ্জন সিংহ। তাঁদের জীবনকথা তুলে ধরেন কনক পাণিগ্রাহী, লহর মজুমদার, সঙ্ঘের প্রান্ত সহ-সম্পর্ক প্রমুখ সুনীলকুমার ঘোষ। অনুষ্ঠান সুচারুরূপে পরিচালনা করেন জেলা সম্পর্ক প্রমুখ নীলমণি দে।

সংস্কার ভারতী সোনারপুর গ্রামীণ শাখার জন্মাষ্টমী উৎসব পালন

গত ২৫ আগস্ট শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী তিথিতে ভগবান কৃষ্ণর মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। ২৮ আগস্ট জগদীশপুর 'শান্তি দেবী হাইস্কুলে' মূল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন কবি শশাঙ্ক মৃধা, প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষক, পতঞ্জলি যোগ সমিতির পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের প্রভারী উদয়কৃষ্ণ মৃধা। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সংগঠন সম্পাদক ভরত কুণ্ডু। কবি ও ছড়ার জাদুকর দুলাল চন্দ্র মণ্ডলকে উত্তরীয় ও মানপত্র দিয়ে বরণ করা হয়। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শুভানুধ্যায়ী পৃথ্বীশ পত্রনবীশ ও তরুণীকান্ত দত্ত। বেলা ২টায় শ্রীকৃষ্ণের ছবি অঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং মহিলাদের প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সোনারপুর গ্রামীণ শাখার সভাপতি বুদ্ধদেব মণ্ডল এবং কোষাধ্যক্ষ পরিমলেন্দু সরকার প্রশ্নোত্তর পত্র নির্বাচিত করেন। ভরত কুণ্ডু প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি জন্মাষ্টমী তিথির তাৎপর্য ব্যাখ্যার্থে এক মনোগ্রাহী বক্তব্য রাখেন। গোপাল দাস বাউল কৃষ্ণের উপর একক গীত পরিবেশন করেন। উল্লেখযোগ্য বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল ছোটদের কৃষ্ণসাজো প্রতিযোগিতা। শিশুরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। সংস্কার ভারতীর সোনারপুর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক শেখর মণ্ডল অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার দায়ভার বহন করেন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। রাজকুমার মিস্ত্রী অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। সভাপতি বুদ্ধদেব মণ্ডল সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পূর্ণকালীন কার্যকর্তা চাই
গো-ভিত্তিক গ্রাম বিকাশের জন্য

গো-সেবা পরিবার গ্রাম বিকাশের জন্য গো-ভক্ত, নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী ব্যক্তিদের পূর্ণ সময় দিয়ে কাজ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। এই কাজের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক। বয়স ৩৫ থেকে ৪৫ বছর। গো-সেবা পরিবার থাকা ও সেবানিধির ব্যবস্থা করবে। আগ্রহী ব্যক্তিরা যোগাযোগ করুন।

গো-সেবা পরিবার
৫২৪ বি, রবীন্দ্র সরণি
কলকাতা- ৭০০ ০০৩
ফোন নং - ৯৩৩১০২৭৪৭১

(ADVT.)

বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ১৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা সমিতির নিজস্ব ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্রের সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী, প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখার্জী, স্বস্তিকার সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য প্রমুখ। সভায় বিগত বছরের (২০১৫-১৬) আয় ব্যয়ের হিসাব দাখিল করা হয় এবং বাৎসরিক কার্যবিবরণী পেশ করা হলে তা সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। সভায় মোট ৪৪ জন সদস্যের মধ্যে ৩৮ জন উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী সুশীল কুমার রায়ের পরিচালনায় আগামী ২০১৬-১৭ সালের কর্মসমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে নতুন সমিতি গঠিত হয় : সভাপতি : অজয় নন্দী, সহ-সভাপতি : তপন কুমার নাগ ও জীবনময় বসু, সম্পাদক : তপন গাঙ্গুলী, সহ-সম্পাদক : বিশ্বনাথ নন্দী, সদস্য : অদ্বৈত চরণ দত্ত, বিদ্যুৎ মুখার্জী, বিজয় আঢ্য, তরুণ পণ্ডিত, প্রণয় রায়,শক্তিশেখর দাস। সভা পরিচালনা করেন সমিতির নব নির্বাচিত সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবী অজয় নন্দী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সহ-সভাপতি তপন গাঙ্গুলী।

বেহালায় স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতা দিবস উদ্‌যাপন

‘স্বামী বিবেকানন্দ কী জয়’, ‘ভারতমাতা কী জয়’ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল বেহালা পর্ণশ্রীর বিবেকান্দ উদ্যান। গত ১১ সেপ্টেম্বর ‘বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রে’র উদ্যোগে ‘স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার ১২৩তম বার্ষিকী’ উদ্‌যাপিত হয় একটি মনোজ্ঞ এবং উৎসাহপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এই উদ্যানে প্রতিষ্ঠিত স্বামীজীর বিশাল মূর্তিতে মাল্যদান এবং পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

স্বামীজীর উদ্দেশে সমবেত গীত এবং ঐতিহাসিক শিকাগো বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ পাঠের পর অনুষ্ঠানের বক্তা শিকাগো ভাষণের প্রেক্ষাপট এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্য সুচারুরূপে বিশ্লেষণ করেন।

পরিশেষে, সভাপতি অলোক বরণ চ্যাটার্জী আসন্ন ভগিনী নিবেদিতার সার্ধশতবর্ষ উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সবার কাছে আহ্বান জানান।

সেবা ভারতী দক্ষিণ ২৪ পরগনার মাতৃ সম্মেলন

গত ৪ সেপ্টেম্বর সেবা ভারতীর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার তিনটি স্থানে তিনটি কার্যক্রম হয়। বারুইপুর সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও যোগ-প্রাণায়াম কেন্দ্রের মিলিত মাতৃ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেবা ভারতীর নিজস্ব গৃহে। আবৃত্তি, গীত, নৃত্য ও শ্রুতি নাটক ইত্যাদি মনোরম অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সমাজ সেবা ভারতীর কার্যকারী সভাপতি শিবদাস বিশ্বাস, আহ্বায়িকা কৃষ্ণা পাল এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বারুইপুর জেলা প্রচারক অমিত সরকার। অনুষ্ঠানের শেষে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্রীদের প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়। মহিলা, শিশু ও কিছু পুরুষ মিলে ১৪০ জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীমতী সুনীতা কর। এছাড়া ওইদিন সূর্যপুরের দু'টি স্থানে আলিপুর ও কেশবপুরে রক্তদাতার রক্তের শ্রেণীকরণ করা হয়। যথাক্রমে ৭৪ ও ৬৯ জনের রক্তের শ্রেণী করন করা হয়। অনুষ্ঠানটির যুগ্ম উদ্যক্তা ছিল সেবা ভারতী ও আরোগ্য ভারতী।

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ সমাপ্তি অনুষ্ঠান

গত ১৮ সেপ্টেম্বর শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে কলকাতায় মহাজাতি সদনের সভাগারে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ সমাপ্তি সমারোহ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। প্রধানবক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ বিকাশের রাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মহেন্দ্রনাথ পাণ্ডে। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিত্ত ও কোম্পানি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শান্তিলাল জৈন। অনুষ্ঠানে কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদহ জেলার বীরনগর শাখার স্বয়ংসেবক তথা বৈষ্ণবনগর বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক স্বাধীন সরকারের পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রনাথ সরকার গত ১৫ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। তিনি ৩ পুত্র ও ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

বর্ধমান জেলার বোলপুর নগর শাখার মুখ্যশিক্ষক গৌরব রায়ের বাবা দেবীপ্রসাদ রায় গত ১৯ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। তিনি ৩ কন্যা ও পুত্র রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বারুইপুর জেলার সুভাষগ্রাম শাখার স্বয়ংসেবক স্বপন ভট্টাচার্যের মা গত ১ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরক্ষেত্র সেবা প্রমুখ তথা সঙ্ঘের দীর্ঘদিনের প্রচারক জয়দেব সিংহরায়ের মাতৃদেবী ভবানীরানি সিংহরায় গত ১৯ সেপ্টেম্বর দুর্গাপুরের সবুজনগরের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, জয়দেব সিংহরায় ১৯৮৫ সালে অস্থির

অবস্থার সময় পঞ্জাবে প্রচারক হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে যান। তার আগে তিনি পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন।

বিজ্ঞপ্তি

পূজাবকাশের জন্য স্বস্তিকা দপ্তর আগামী ৭ থেকে ১৫ অক্টোবর ছুটি থাকবে। ১৭ অক্টোবর থেকে যথারীতি দপ্তর খোলা থাকবে। এই কারণেই ১০ এবং ১৭ অক্টোবর স্বস্তিকার কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। ২৪ অক্টোবর (দীপাবলী সংখ্যা) থেকে যথারীতি প্রকাশিত হবে।

— **সম্পাদক, স্বস্তিকা**

পূর্বস্থলীতে বলরাম পূজা

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী খণ্ডের কালিকাতলা বাজারে ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের উদ্যোগে ভগবান শ্রীশ্রীবলরাম পূজার আয়োজন করা হয় গত ৭ সেপ্টেম্বর। অনুষ্ঠানে কিষান সঙ্ঘের শচীন্দ্রকুমার রায় উপস্থিত ছিলেন।

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৩

প্রকাশিত হয়েছে

পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করে পড়ার মতো

উপন্যাস

শেখর সেনগুপ্ত - **সমুদ্ভাবিত অনুত্তম**
সুমিত্রা ঘোষ - **শিরিণ**
জিষ্ণু বসু - **আমি মাধবী চট্টোপাধ্যায় বলছি**

গল্প

রমানাথ রায় - **ভালোবাসার রকমফের**
শেখর বসু - **অন্তরালে**
এষা দে - **একতলার বাসিন্দা**
প্রবাল চক্রবর্তী - **দানবোত্থা ভবিষ্যতি**
গোপাল চক্রবর্তী - **দেশান্তর**

রম্যরচনা

সুন্দর মৌলিক - **চীনের চাউমিন আমাদের চাউমিন**

ভ্রমণ কথা

কুণাল চট্টোপাধ্যায় — **চীন থেকে ফিরে**

চরিতকথা

জহর মুখোপাধ্যায় — **স্বামীজীর চারতীর্থে কুমারী পুজো**

ইতিহাস

সৌমেন নিয়োগী - **সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এক স্থাপত্য— তালকাড**

খেলা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় - **বিশ্বশ্রীর মন্দিরে বেহাল দশা**

প্রবন্ধ

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস - **মীরা পঞ্চশতী**

ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী - **শকাব্দ : ভারতের নিজস্ব জাতীয় কালপঞ্জী**

ড. প্রণব চট্টোপাধ্যায় - **ভগিনী নিবেদিতা ও সরলাদেবী চৌধুরানি**

ড. তুষারকন্তি ঘোষ - **উত্তরবঙ্গের ভারতভুক্তি আন্দোলনের এক বিস্ময়কর কাহিনি**

দেবীপ্রসাদ রায় - **আইনস্টাইনের ঈশ্বর ও ধর্মভাবনা এবং বেদান্ত**

অমলেশ মিশ্র - **বিশ্বের প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগর**

রবিরঞ্জন সেন - **মহারাষ্ট্রের ভক্ত-কবি পরম্পরা ও মারাঠা জাতীয় জাগরণ**

রজত পাল - **ঋকবেদ ও জেন্দ আবেস্তা**

অরিন্দম মুখোপাধ্যায় - **ছিন্ন তমসুকের কাহিনি**

অর্ণব নাগ - **রঘু ডাকাত : রূপকথায় ও বাস্তবে**

বিনোদন

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় - **অবিস্মরণীয় কমেডিয়ানরা**

নবাঙ্কুর (ছোটদের বিভাগ)

সিদ্ধার্থ সিংহ - **অমরত্ব**
বিরাজ নারায়ণ রায় - **মহাদেবের ষাঁড়**
শান্তনু গুড়িয়া - **শব্দরূপ**। শৌনক রায়চৌধুরী - **ধাঁধা**

দাম : ৭০.০০ টাকা

শব্দরূপ-৮০৬ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

১	■	■	২		৩		■
	■	■		■		■	■
৪	৫			■	৬	৭	
■		■	■	■	■		■
■		■	■	■	■		■
৮		৯	■	১০			১১
■	■		■		■	■	
■	১২				■	■	

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. দুর্যোধনের আদরের নাম, ৪. রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; 'ঘরের শত্রু', ৬. দুর্যোধনের মাতুল, ৮. নবপ্রসূতা, ১০. যাকে (যে নদনদীকে) সহজে পার হওয়া যায়, ১২. নীলপদ্ম।

উপর-নীচ : ১. 'কিরাতার্জুনীয়' কাব্যরচয়িতা কবি, ২. রামায়ণে বানরদের মধ্যে ডাক্তার, ৩. মহাধনী, কুবের, বৃহৎ-চঞ্চু পক্ষীবিশেষ, ৫. বার্ধক্যের জন্য বুদ্ধিভ্রংশ, ৭. ভূমিসাৎ, পরাভূত, ৯. যমুনা, ১০. সুস্বাদু, ১১. গুঞ্জা, কুঁচ।

সমাধান
শব্দরূপ-৮০৩

তা	জ্ঞা	ম	■	নী	লা	চ	ল
লা	■	য়	■	লা	■	■	ক্ষ
ক	■	দা	ড়ি	স্ব	■	■	ণা
■	■	ন	■	র	বি	■	■
■	■	ব	ল	■	ব	■	■
ব	■	■	ব	ল	দ	■	দ
সু	■	■	ড	■	মা	■	স্ব
ধা	নী	ল	স্কা	■	ন	কু	ল

সঠিক উত্তরদাতা

সুনীল বিষ্ণু
সিউড়ী, বীরভূম।
সৌরভ পাত্র
বাঁকুড়া

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

৮০৬ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৪ নভেম্বর ২০১৬ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

এখন দেশে যেমন মেশিনের অন্ধভক্ত রয়েছেন, তেমনি ঘোর বিরোধীরাও রয়েছেন। একদল মনে করেন মেশিনের আধুনিকীকরণের অভাবেই ভারতে দারিদ্র্য রয়ে গেছে, অন্যদল মনে করেন দেশের অধঃপতনের মূল করণ মেশিনের বহুল ব্যবহার ও অত্যধিক যন্ত্রীকরণ। বাস্তবে, মেশিন মানুষের শত্রু বা মিত্র নয়। এটি এক উপকরণমাত্র এবং এর উপযোগিতা সমাজের বহু শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে। যে-কোনো নতুন মেশিনের জন্য উৎপাদন ব্যবস্থা গতি পেতে পারে। যদি— (১) বর্ধিত উৎপাদন থেকে প্রাপ্ত আয় শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সঠিকভাবে বিতরণ হয়ে থাকে। (২) এই আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় ও উপভোগ— দুটিই হয়। (৩) দেশে মুলধন নির্মাণের গতি এমন পরিমাণে হোক যাতে নতুন মেশিন কেনার পরও শ্রমিকদের কিছু দিয়ে, অন্যদেরও কাজ দেওয়ার জন্য শিল্প বা ব্যবসা শুরু করা যেতে পারে।

* * *

মূলধনের এক গুরুত্বপূর্ণ স্বরূপ হলো মেশিন। মানুষের শ্রম সুলভ করা ও তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে। যন্ত্র মানুষের সহায়ক, প্রতিযোগী নয়। যেখানে মানুষের শ্রমকে বিনিময়ের বস্তু মনে করে তার মূল্যায়ন টাকার মাধ্যমে নির্ধারিত হচ্ছে, সেখানে যন্ত্র মানুষের প্রতিযোগী হয়ে পড়েছে। এটা পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কুফল। যদি মেশিন মানুষের স্থান দখল করে তাদের উপবাসে রাখে, তাহলে তা উদ্দেশ্যের বিপরীত হবে। জড় মেশিন এরজন্য দায়ী নয়। এর দায় সেই অর্থ-ব্যবস্থার যেখানে বিবেক লুপ্ত হয়ে যায়। মেশিনের কার্যক্ষমতা বিচার করেই তার উপযুক্ততা নির্ধারণ করতে হবে।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

থাকে যদি
ডাটা
জমে যায় রান্নাটা
DUTA
SPICE POWDER & PAPAD
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
DUTA
50g
TURMERIC
POWDER
CUMIN POWDER
TURMERIC POWDER
CORIANDER POWDER
RED CHILLI POWDER
Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.
Regd. Office : 207, Maharshi Debendra Road, Kolkata - 700007
Contact : (M) 98366-72200 / (033) 2259-1796/5548
Email : dutaspice@gmail.com | Website : www.dutaspices.com

অধ্যাপনার ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ড. সীতানাথ গোস্বামীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ অধ্যাপনার ৬০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে আচার্য মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক ড. সীতানাথ গোস্বামীকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য সম্প্রতি এক অনুষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্ কালচারে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণা-বিভাগের অধ্যক্ষ স্বামী যাদবেন্দ্রানন্দ মহারাজ। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে 'আচার্যোপদেশ' নামক প্রশস্তি পাঠের পর তিনি ড. গোস্বামীর জ্ঞানবত্তা এবং বেদান্তপ্রীতির কথা সর্বসমক্ষে বিশেষভাবে তুলে ধরেন। বিদ্যার্থীবৃন্দের পক্ষ থেকে যে মানপত্র অধ্যাপক গোস্বামীকে প্রদান করা হয় তা পাঠ করেন সভার সঞ্চালক ড. প্রজ্ঞারঞ্জন দত্ত। একমাত্র ভালবাসার কারণে অধ্যাপক গোস্বামী বেদান্তের এই পঠন-পাঠন কাজে ব্রতী হয়েছিলেন এবং এখনও এই কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সুদীর্ঘ অষ্টাশি বছর বয়সেও করে চলেছেন। তিনি স্বভাবসিদ্ধ

শিক্ষক, জাতির গৌরব এবং দেশের সম্পদ। তাঁর আদর্শ অনুশীলনযোগ্য।

বহু বরেণ্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানে শান্তিমন্ত্র পাঠ করেন বেদান্তেরই ছাত্রী কুন্তলা ঘোষ। কাটোয়া থেকে এসে বেদান্তের ছাত্র ৮৬ বছর বয়স্ক সঞ্জীব ঘোষচৌধুরী শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের কিছু অংশ সঙ্গীতাঞ্জলির মাধ্যমে পরিবেশন করেন। গীতার মোক্ষ যোগের কিছু অংশ পরিবেশন করেন Advanced Vedanta শ্রেণীর ছাত্র অলোকেন্দু দাস। অধ্যাপক গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করে সংক্ষিপ্ত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ড. জয়ন্তী মুখার্জী, ড. শর্বাণী বসু, ড. সুমিতা চৌধুরী, অধ্যাপিকা গীতা পালিত, অধ্যাপক অরূপরঞ্জন প্রধান, চন্দন গুহ এবং নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

এই শুভদিনে ড. গোস্বামী স্বনামধন্য পণ্ডিত বুনো রামনাথের ঐতিহ্যের কথা বিশেষভাবে তুলে ধরেন। অধ্যাপক গোস্বামী মঙ্গলময়ের ইচ্ছাতেই সবকিছু হচ্ছে তা বিশেষভাবে বলেন। তাঁর কাছে গবেষণা করে ৪০ জনেরও অধিক ছাত্রছাত্রী পিএইচডি এবং ডিলিট্ (বিদ্যা-বাচস্পতি) উপাধি লাভ করেন। তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই অধ্যাপক-অধ্যাপিকার পদে বৃত আছেন; আবার অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদও অলঙ্কৃত করেছেন।

অধ্যাপক গোস্বামীর সুদীর্ঘ, সুস্থ ও মঙ্গলময় জীবন বিশেষভাবে কামনা করে এই অনুষ্ঠান শেষ হয়।

জীবন বিপন্ন করে ত্রাণকাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মালদহ জেলার বৈষ্ণবনগর ব্লকের বীরনগর গ্রামের ভয়াবহ গঙ্গাভাঙনে যখন একটি আস্ত পাড়া নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে সেই সময়ের একটি ঘটনা সকলের মনে গভীর রেখাপাত করে। গত আগস্ট মাসের গঙ্গার ভাঙনের শুরু থেকেই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা ত্রাণকাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গত ২০ আগস্ট রাত্রি ৯টায় ১৭ মাইল গ্রামে কালিয়াচক মহকুমা সেবা প্রমুখ বিধান মণ্ডলের কাছে খবর এলো বীরনগর গ্রামে আবার ভাঙন শুরু হয়েছে, এখনই দলবল নিয়ে সেখানে পৌঁছতে হবে। ভাঙন কবলিত সেই গ্রামের বিভিন্ন বাড়ি থেকে আসবাবপত্র ও দরজা জানালা সরাতে হবে। বাড়ির লোকদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে হবে। ২০-২৫ জন স্বয়ংসেবকের একটি টিম নিয়ে বিধান যখন বীরনগর গ্রামে পৌঁছন তখন রাত্রি ১টা। একের পর এক বাড়ি চোখের সামনে গঙ্গায় তলিয়ে যাচ্ছে। একটি বাড়িতে যখন তাঁরা আসবাবপত্র সরাতে ব্যস্ত তখনই বাড়িটি ধসে যায়। বিধান তখন জানালা সরাচ্ছিলেন। জানলার পাটাতন সমেত তিনি গঙ্গায় তলিয়ে যান। সকলেই হায় হায় করে উঠলেন। জানালার সঙ্গে থাকা লোহার তারে পেঁচিয়ে ঘূর্ণি জলের মধ্যে পড়ে যাওয়ায় তাঁর বাঁচার আশা প্রায় সকলেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরে সকলকে অবাক করে দিয়ে বিধান জলের উপরে উঠলেন। চোখ মুখ লাল, শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে দর দর করে রক্ত ঝরছে। তখন রাত্রি ৩টা। জল থেকে বিধানকে টেনে তোলা হয়। যে ভাবে বিধান গঙ্গায় তলিয়ে গিয়েছিলেন, কেউ ভাবতে পারেনি বাঁচবে। গ্রামবাসীদের কথায়— শিব জ্ঞানে জীব সেবা স্বয়ংসেবকদের ব্রত। তাই বিধানকে মা গঙ্গাই বাঁচিয়ে দিলেন।

সবার প্রিয়

বিল্লদা ®

চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'

কালিকাপুর,

বোলপুর,

জেলা : বীরভূম

ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭

মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
3 October - 2016 - Rs. 10.00,

Published by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6 and Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. E-mail : swastika5915@gmail.com ।। দাম ১০ টাকা ।।